ইত্তিলা'

ইছলামী-জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য ত্রৈমাসিক

শিরোনাম সমূহ

- হাজ্জ ও 'উমরাহ পালনকারীর জন্য সঠিক পথ-নির্দেশ
- জামা'আতে নামাযে দাঁড়ানোর পদ্ধতি, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
- ক্বোরবানীর তাৎপর্য ও বিধান
- হাজ্জ ও 'উমরাহ্ পালনের ছুন্নাহ্সম্মত পদ্ধতি

সংখ্যা-০৩ | যিলহাজ্জ- ১৪৩৪ হিজরী, কার্তিক- ১৪২০ বাংলা, অক্টোবর- ২০১৩ ইংরেজী। পৃষ্ঠা সংখা-১২ | শুভেচ্ছা মূল্য-০৭ টাকা

হাজ্জ ও 'উমরাহ পালনকারীর জন্য সঠিক পথ-নির্দেশ

মূল: আশ্শাইখ 'আব্দুল মুহ্সিন আল 'আব্বাদ আল বাদ্র (হাফিযাহুল্লাহ্)

হাজ্জ বা 'উমরাহ্ পালনকারীর করণীয়:-

১। হাজ্জ বা 'উমরাহ্ পালনেচ্ছুক ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইখলাস। সে তার 'আমলকে অবশ্যই একমাত্র আল্লাহ্র (ﷻ) জন্য খাঁটি করবে। আল্লাহ্র (ﷻ) সন্তুষ্টি অর্জনই হতে হবে তার একমাত্র উদ্দেশ্য। লৌকিকতা (মানুষকে দেখানো), জনশ্রুতি (মানুষকে শুনানো) কিংবা অন্য কোনরূপ জাগতিক উদ্দেশ্য হতে তার 'আমল হতে হবে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাহলেই সে তার হাজ্জ বা 'উমরাহ্র ছাওয়াব অর্জন করতে পারবে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীছে ক্বোদ্ছীতে রয়েছে যে, রাছূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন:- আল্লাহ্ (ﷻ) ইরশাদ করেছেন:- অর্থ- আমি অংশীদারদের অংশীদারিত্বের আদৌ মুখাপেক্ষী নই। যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল- যাতে আমার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করল, তাহলে আমি তাকে এবং তার শির্কযুক্ত কাজকে ছেড়ে দেই। (সাহীহ্ মুছলিম- ৭৪৭৫)

আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাছূলুল্লাহ্ (ﷺ) যখন হাজ্জ সম্পাদন করছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন- অর্থ- হে আল্লাহ! এই হাজ্জ (কেবল তোমারই জন্যে), এতে লোক দেখানো বা লোক শুনানোর কোন উদ্দেশ্য নেই। (ইবনু মাজাহ। এই হাদীছটি ছনদের দিক থেকে যদিও দুর্বল, তবে এর সমার্থক ও সমর্থনে অন্য হাদীছ থাকার দরুন এটি হাছান লি-গায়রিহীর পর্যায়ভুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য)

২। হাজ্জ বা 'উমরাহ্ সম্পাদনের পূর্বে অবশ্যই এর সঠিক নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান ভালোভাবে জেনে নিতে হবে। এজন্য শাইখ 'আব্দুল 'আযীয ইবনু বায রাহিমাহুল্লাহ্ সংকলিত "আত্ তাহ্ক্বীক্ব ওয়াল ঈযাহ্ লি কাছীরিম মিম মাছা-ইলিল হাজ্জ ওয়াল 'উমরাহ্ ওয়ায্ যিয়ারাহ্ 'আলা যূয়িল কিতাবি ওয়াছ্ ছুন্নাহ্" পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করা যেতে পারে। তাছাড়া সত্যিকার 'উলামায়ে কেরামের নিকট থেকেও এতদ্বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে।

আর শুধু হাজ্জ বা 'উমরাহ-ই নয় বরং যে কোন 'আমল বা 'ইবাদত করার পূর্বে এর সঠিক বিধি-বিধান ও বিশুদ্ধ ছুন্নাহ্-সম্মত নিয়ম-পদ্ধতি হাক্ব্যানী 'উলামায়ে কেরামের নিকট হতে জেনে নেয়া একান্ত আবশ্যক, যাতে করে 'আমল ও 'ইবাদতের ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি ও বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকা যায় এবং প্রকৃত অর্থেই 'আমলটি "নেক 'আমল" বলে গণ্য হয়।

৩। হাজ্জের ছফরে এমন কিছু নেক্কার-ভালো লোকের সাহচর্যে থাকার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী ও প্রয়াসী হতে হবে, যাদের থেকে জ্ঞান (দ্বীন) ও শিষ্টাচার তথা আদব-আখলাক্ব শিক্ষা করা যায়। আবূ মূছা আল আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি (৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

আল্লাহ্র (ﷻ) বাণী

অর্থ- আর যে লোক ইছলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম তালাশ করে, তা কখনই তার নিকট হতে গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত। কেমন করে আল্লাহ এমন সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করবেন- যারা ঈমান আনার পর, রাছূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে যাওয়ার পরও অবিশ্বাসী হয়েছে? আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না। ওদের প্রতিফল হলো যে, নিশ্চয় তাদের উপর আল্লাহ, ফিরিশতাগণ এবং মানুষ; সকলেরই অভিসম্পাত।

(ছূরা আ-লে 'ইমরান- ৮৫-৮৭)

ছালাফে সালিহীনের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) অমূল্য কথা

'আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেছেন:- মানুষের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক যখন সংশোধন হয়ে যাবে, তখন গোঁটা জাতি সংশোধন হয়ে যাবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো- এই দুই প্রকারের লোক কারা? উত্তরে তিনি বললেন:- শাসকবর্গ এবং 'আলিমগণ। (সূত্র:-ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন- পৃষ্ঠা নং- ১৭)

জামা'আতে নামাযে দাঁড়ানোর পদ্ধতি, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইত্তিলা' ডেস্ক:

সালাত হলো দ্বীনে ইছলামের দ্বিতীয় রুক্ন। ইছলাম ও কুফ্রের মধ্যে পার্থক্য-বিধানকারী যেসব বিষয় রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হলো- সালাত। আল্লাহ্র (ﷻ) আদেশকৃত প্রতিটি বিধি-বিধানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে অসংখ্য হিকমাত। এসবের বেশিরভাগই মানবজাতি তার স্বল্প ও সীমিত জ্ঞান দ্বারা বুঝতে অক্ষম-অপারগ। তবে সর্বাবস্থায় তা পালনের মধ্যেই রয়েছে মানুষের ইহ-পরকালের মুক্তি ও কল্যাণ।

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুছলমান পুরুষের জন্য পাঁচ ওয়াক্তে ফার্য সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা ইছলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান। ইছলামের এই বিধানটির মূলেও অসংখ্য হিকমাত নিহিত রয়েছে। এর মধ্যে যেমন রয়েছে- মুছলমানদের পারস্পরিক ভেদাভেদ, অনৈক্য ও হিংসা-বিদ্বেষ দূর করার এবং তাদের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী, ভালোবাসা, ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টির এক অনন্য প্রশিক্ষণ, তেমনি এটি হলো- মুছলমানদের ঐক্যের প্রতীক। "মুছলমানদের মধ্যে সাদা-কালো, ধনী-গরীব, বাদশাহ্-ফক্বীর, আশরাফ-আত্বরাফ বা জাত-বংশের কোন তারতম্য ও ভেদাভেদ নেই। তারা সকলেই আল্লাহ্র (ﷻ) বান্দাহ্ এবং পরস্পর ভাই ভাই। আল্লাহ্র পথে তারা সকলেই ঐক্যবদ্ধ"। গোঁটা বিশ্বকে এই নীরব বার্তা পৌঁছে দেয়ার এবং এর বাস্তব চিত্র প্রদর্শনের অন্যতম মাধ্যম হলো- পাঁচ ওয়াক্তে জামা'আতে সালাত। আর এই জামা'আতে সালাত ক্বায়িমের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম একটি বিষয় হলো সফ (ক্বাতার) ঠিক করা।

ক্বাতার (সফ) ঠিক করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

সফ সোজা-সঠিক করা হলো জামা'আতে সালাতের প্রথম কাজ। মুছলমানদের অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ ও পারস্পরিক মতানৈক্য দূর করা, তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও ঐক্য সৃষ্টি করা এবং তা অটল ও অটুট রাখা, নামাযে বিনয় ও একাগ্রতা লাভ, শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষা, নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্র (ﷻ) রাহ্মাত ও নৈকট্য লাভ ইত্যাদির অনেকটাই নির্ভর করে নামাযে সঠিকভাবে সফবন্দী হওয়ার উপর। **সঠিকভাবে সফবন্দী হওয়া ছাড়া নামায পরিপূর্ণ হয় না, এবং সেই নামায সঠিকভাবে ক্বায়িম হয়েছে বলেও গণ্য হয় না। হাদীছে বর্ণিত রয়েছে, রাছূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন- অর্থ- তোমরা তোমাদের সফগুলো সোজা করো, কেননা সফ সোজা করা নামায ক্বায়িমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। (সাহীহ্ বুখারী- ৭২৩)**

আনাছ ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাছূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন- অর্থ- তোমরা তোমাদের সফগুলো সোজা; ঠিকঠাক করো, কেননা সফ সোজা করা নামাযের পরিপূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত। (সাহীহ্ মুছলিম- ৪৩৩)

আর অসম্পূর্ণ সালাত কিংবা সঠিকভাবে ক্বায়িম করা হয়নি এমন সালাত আল্লাহ্র (ﷻ) কাছে মাক্ববূল হওয়ার আশা করা যায় না। একারণেই রাছূলুল্লাহ্ (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) জামা'আতে সালাত আদায়কালীন সফ ঠিক করার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সফ সোজা ও ঠিকঠাক না হতো ততক্ষণ তাঁরা নামাযই শুরু করতেন না।

রাছূলুল্লাহ্ (ﷺ) জামা'আতে নামায শুরু করার আগে একাধিকবার সাহাবায়ে কেরামকে (রাঃ) শীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ফাঁক-ফোকর বন্ধ করে একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে ক্বাতার সোজা করে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিতেন। ক্বাতার সোজা করার জন্য প্রয়োজনে তিনি লাঠিও ব্যবহার করতেন। নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- অর্থ- আমরা যখন নামাযে (জামা'আতে) দাঁড়াতাম তখন রাছূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাদের সফগুলো ঠিক করাতেন। আমরা (৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

হাজ্জ ও 'উমরাহ পালনের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মনে মনে একথাও বলবেন যে, "যদি কোন প্রতিবন্ধক আমাকে হাজ্জকর্ম সম্পাদন থেকে রুখে দেয়, তাহলে যেখানে আমাকে রুখে দেবে সেখানে সে অবস্থাতেই আমি হালাল হয়ে যাব তথা ইহ্‌রাম ত্যাগ করব"। আর যদি এরূপ কোন কিছুর আশঙ্কা না থাকে, তাহলে অযথা হাজ্জের নিয়্যাতের সাথে কোনরূপ শর্ত জুড়ে দিবেন না।

৩) হাজ্জের নিয়্যাত অর্থাৎ ইহ্‌রাম বাঁধার পর ইহ্‌রাম ভঙ্গকারী তথা ইহ্‌রাম-বিরোধী যাবতীয় কাজকর্ম থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

৪) অতঃপর তখন থেকে ১০ই যিলহাজ্জ- জামরাতুল 'আক্বাবাহ্-তে পাথর নিক্ষেপ শেষ হওয়া পর্যন্ত বেশি বেশি তালবিয়াহ্ (লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান্ নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক। লা-শারীকা লাক) পাঠ করতে থাকবেন।

৫) তারপর আপনি তালবিয়াহ্ পড়তে পড়তে মীনায় চলে যাবেন। সেখানে যুহ্‌র, 'আসর, মাগরিব, 'ইশা ও ফাজ্‌র প্রত্যেক সালাত যথাসময়ে আদায় করবেন। তবে চার রাকা'আতের ফার্‌য সালাত ক্বাস্‌র হিসেবে দু'রাক্'আত আদায় করবেন। আপনি যদি মাক্কার অধিবাসীও হয়ে থাকেন, তথাপি উপরোক্ত সালাতগুলো ঐদিন মীনায় আপনাকে ক্বাস্‌র হিসেবেই আদায় করতে হবে।

৬) সব সময় নামাযের পর এবং সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য যেসব দু'আ ও যিক্‌র-আয্‌কার রাছূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত রয়েছে সেগুলো পাঠ করবেন।

৭। ৮ই যিলহাজ্জ দিবাগত রাত মীনায় যাপন করবেন। রাছূলুল্লাহ্ ﷺ হাজ্জকালীন এ রাত এখানেই কাটিয়েছেন।

৯ই যিলহাজ্জ, এ দিনে করণীয়

এ দিনটি হলো হাজ্জের ২য় দিন। ৮ই যিলহাজ্জ দিবাগত রাত মীনা ময়দানে যাপনের পর ফাজ্‌রের সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করবেন।

১) ৯ই যিলহাজ্জ সূর্য উদয়ের পর তালবিয়াহ্ ও তাকবীর (আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ) যথাসম্ভব উচ্চ আওয়াযে পড়তে পড়তে 'আরাফাহ্‌র দিকে রওয়ানা হবেন।

সাবধান! এ দিন রোযা রাখবেন না। কেননা রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এ দিনে রোযা রাখেননি। বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা জানা যায় যে, এদিন রাছূলুল্লাহ্-কে (ﷺ) এক পেয়ালা দুধ দেয়া হলে তিনি তা পান করেন।

২) 'আরাফাহ্‌র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে প্রথমে নামিরাহ্ নামক স্থানে সম্ভব হলে সূর্য ঢলা পর্যন্ত অর্থাৎ যুহ্‌রের সালাতের সময় শুরু হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবেন। নামিরাহ্ হলো 'আরাফাহ্‌র নিকটবর্তী একটি স্থান।

৩) সূর্য ঢলে গেলে অর্থাৎ যুহ্‌রের ওয়াক্বত শুরু হয়ে গেলে সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে 'উরানাহ্ উপত্যকায় অবতরণ করবেন। ('উরানাহ্ উপত্যকা 'আরাফাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত নয় বরং তা 'আরাফাহ্‌র মাঠের সীমার বাইরে অবস্থিত।)

সেখানে ইমাম সাহেব একটি খুতবাহ্ প্রদান করবেন। অতঃপর সেখানে জামা'আতের সাথে যুহ্‌র ও 'আসরের সালাতকে জাম'য়ে তাক্বদীম অর্থাৎ যুহ্‌রের ওয়াক্বতে যুহ্‌র ও 'আসরের সালাত একত্রে ক্বাস্‌র করে অর্থাৎ চার রাকা'আতের বদলে দু রাক্'আত করে পড়বেন।

যদি ইমামের সাথে সালাত আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে সেই একই পদ্ধতিতে ওয়াক্বতদ্বয়ের সালাত একাকী অথবা নিজের আশেপাশে আরো যারা জামা'আতে সালাত আদায় করতে পারেননি তাদের নিয়ে জামা'আতে আদায় করে নিবেন।

এই দু'টি সালাতের জন্য একটি আযান ও দু'টি ইক্বামত হবে। সাবধান! এই দুই ওয়াক্বত সালাতের মাঝখানে ছুন্নাত বা নফল কোন সালাত আদায় করবেন না।

৪) অতঃপর 'আরাফাহ্‌র মাঠে নিজের অনুপ্রবেশ নিশ্চিত করবেন এবং সম্ভব হলে জাবালে রাহ্‌মাতের নিচে "সাখারাত" নামক স্থানের কাছে; জাবালে রাহ্‌মাতকে আপনার ও ক্বিবলাহ্‌র মাঝখানে রেখে অবস্থান করবেন। যদি এভাবে করা সম্ভব হয় তাহলে সেটা উত্তম। আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে অবশ্যই মনে রাখবেন যে, হাজ্জের অন্যতম রুক্ন হলো 'আরাফাহ্‌র মাঠে অবস্থান। তাই অবশ্যই আপনাকে 'আরাফাহ্‌র সীমানার মধ্যে যে কোন জায়গায় অবস্থান করতে হবে। সমস্থ 'আরাফাহ্ই অবস্থান স্থল।

৫) 'আরাফাহ্-তে অবস্থানকালীন সূর্যাস্ত পর্যন্ত পুরো সময়টা আল্লাহ্‌র যিক্‌র আযকারে মাশগুল থাকবেন। বেশি বেশি তাহ্‌লীল (লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর), তালবিয়াহ্ (লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান্ নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক, লা-শারীকা লাক) এবং রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রতি সালাত পাঠ করবেন এবং পূর্ণ বিনয় ও আনুগত্য সহকারে একনিষ্ঠ মনে ক্বিবলাহ্‌মুখী হয়ে দু'হাত তুলে মহান আল্লাহ্‌র (ﷻ) নিকট দু'আ করবেন।

৬) সূর্যাস্তের আগে 'আরাফাহ্ থেকে বের হবেন না। এটা নিষিদ্ধ এবং জাহিলিয়্যাতের কাজ। যদি কেউ সূর্যাস্তের আগে 'আরাফাহ্ থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে অধিকাংশ 'উলামায়ে কেরামের অভিমত হলো- তাকে ফিদইয়াহ্ আদায় করতে হবে এবং তা হরমের আশেপাশে অবস্থানরত ফক্বীর-মিছকীনদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হবে।

৭) সূর্যাস্তের পর আস্তে-ধীরে শান্তি ও স্বস্তিতে আল্লাহ্‌র যিক্‌র-ইছ্‌তিগফার করতে করতে মুযদালিফাহ্‌র দিকে রওয়ানা হবেন। কোথাও যদি রাস্তা একটু ফাঁকা পান বা সুযোগ থাকে তাহলে হালকা দ্রুত চলার চেষ্টা করবেন। এটা ছুন্নাহ্। রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এমনই করতেন।

৮) মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরিব ও 'ইশার সালাত একত্রে আদায় করবেন। মাগরিবের সালাত তিন রাকা'আত আদায় করবেন এবং 'ইশার ফার্‌য সালাত চার রাকা'আতের স্থলে দু রাক্'আত পড়বেন। অতঃপর শুধুমাত্র ওয়িত্‌র (বিত্‌র) ব্যতীত আর কোন নফল বা ছুন্নাত সালাত পড়বেন না।

যদি আশঙ্কা হয় যে, রাস্তায় অত্যাধিক ভীড় বা অন্য কোন কারণে অর্ধ রাত্রির আগে তথা 'ইশার সালাতের সময়ের মধ্যে মুযদালিফায় পৌঁছতে পারবেন না, তাহলে আপনি পথিমধ্যে উপরোক্ত নিয়মে মাগরিব ও 'ইশার সালাত আদায় করে নিবেন।

৯) মুযদালিফায় পৌঁছে আপনি সেখানে ফাজ্‌র পর্যন্ত ঘুমান। তবে **দুর্বল পুরুষ ও মহিলারা অত্যধিক ভীড় এড়ানোর জন্য চাইলে অর্ধ রাত্রির পর মুযদালিফাহ্ ছেড়ে মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে উত্তম হলো চাঁদ অদৃশ্য হওয়ার পরে মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া। নতুবা মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা আবশ্যক।**

১০ই যিলহাজ্জ, এ দিনে করণীয়

১) এ দিনটি হাজ্জের তৃতীয় দিন। এ দিন ফাজ্‌রের সালাত মুযদালিফায় আদায় করে নামায শেষে পঠিতব্য যে সব মাছনূন দু'আ-দুরূদ ও যিক্‌র-আযকার রয়েছে সেগুলো পাঠ করবেন। তারপর তাহ্‌মীদ, তাক্‌বীর, তাহ্‌লীল এবং আল্লাহ্‌র দরবারে দু'হাত তোলে দু'আ করবেন। ভোরের আকাশ উজ্জল না হওয়া পর্যন্ত এসব 'আমল চালিয়ে যাবেন।

২) তারপর সূর্য উঠার আগেই তালবিয়াহ্ পড়তে পড়তে মীনা-র দিকে রওয়ানা হবেন। এসময় কোনরূপ তাড়াহুড়া করবেন না। বরং ধীরে-সুস্থে এগিয়ে যাবেন।

৩) মীনায় যাওয়ার পথে যখন "ওয়াদী মুহাচ্ছির" বা মুহাচ্ছির্ উপত্যকায় পৌছবেন তখন সে জায়গাটুকু যথাসম্ভব দ্রুত অতিক্রম করার চেষ্টা করবেন।

৪) মুযদালিফাহ্ থেকে মীনায় যাওয়ার পথে যে কোন স্থান থেকে কিংবা মীনা থেকে বুটের (চানার) দানা থেকে একটু বড় সাতটি ছোট ছোট পাথর কুঁড়িয়ে নিবেন।

৫) তারপর জামরায়ে 'আক্বাবাহ্-তে পৌঁছে যাবেন। সেখানে গিয়ে জামরায়ে 'আক্বাবাহ্‌র দিকে মুখ করে মীনা-কে ডানে এবং মাক্কাকে বামে রেখে জামরায়ে 'আক্বাবাহ্-তে পর পর সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবেন। প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময় বলবেন "আল্লাহু আক্‌বার"। পাথরগুলো এমনভাবে নিক্ষেপ করবেন যাতে সেগুলো গর্তে পড়ে। নিক্ষেপিত পাথর যেন গর্তের বাহিরে না পড়ে সে দিকে খেয়াল রাখবেন। মনে রাখবেন যে, ১০ই যিলহাজ্জ সূর্যোদয়ের পর পাথর নিক্ষেপ করতে হবে, আগে নয়।

৬) পাথর নিক্ষেপের পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত তাকবীর এবং তাহ্‌লীল পড়তে থাকবেন। তবে পাথর নিক্ষেপ শুরু করার সাথে সাথে তালবিয়াহ্ পড়া বন্ধ করে দিবেন।

৭) অতঃপর আপনি যদি ক্বোরবানী করতে চান তাহলে মীনায় ক্বোরবানীর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে এসে আপনার পশু নিজ হাতে ক্বোরবানী করবেন, এটাই উত্তম। যদি সম্ভব না হয় তাহলে প্রতিনিধির দ্বারা ক্বোরবানী করিয়ে নিবেন। সমগ্র মীনা এবং মাক্কার অলিগলি যে কোন স্থানে ক্বোরবানী করা যাবে। তবে মনে রাখবেন যে, আপনি যদি তামাত্তু' অথবা ক্বিরান হাজ্জ পালনকারী হয়ে থাকেন তাহলে আপনার উপর ক্বোরবানী করা ওয়াজিব; অবশ্যই আপনার ক্বোরবানী দিতে হবে। তবে হাজ্জে ইফরাদ পালনকারীর উপর ক্বোরবানী ওয়াজিব নয়।

৮) ক্বোরবানীর গোশ্‌ত আপনি নিজে খাবেন এবং ফকির-মিছকীনদের মধ্যে বন্টন করে দিবেন।

৯) তারপর আপনি হাজ্জ পালনকারী যদি পুরুষ হন, তাহলে সমস্ত মাথা মুন্ডাবেন অথবা চুল কেটে ছোট করবেন। তবে মাথা মুন্ডানোই উত্তম। আর আপনি যদি মহিলা হন, তাহলে চুল একত্র করে মুঠ করে ধরে আঙ্গুলের অগ্রভাগ কিংবা তার চেয়ে একটু বেশি পরিমাণ চুল অগ্রভাগ থেকে কেটে ফেলবেন।

এই পর্যায়ে এসে আপনি প্রায় হালাল হয়ে যাবেন, অর্থাৎ ইহ্‌রাম অবস্থায় যা কিছু আপনার জন্য নিষিদ্ধ ছিল সব কিছুই (শুধুমাত্র স্ত্রী ব্যতীত) আপনার জন্য হালাল হয়ে যাবে। আপনি তখন ইহ্‌রামের কাপড় খুলে আপনার স্বাভাবিক পোষাক পরিধান করে নিতে পারবেন।

১০) অতঃপর এ দিনই অর্থাৎ ১০ যিলহাজ্জ সূর্যাস্তের পূর্বেই ৭ বার বাইতুল্লাহ্‌র ত্বাওয়াফ সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন। একান্ত যদি এদিন সম্ভব না হয় তাহলে অবশ্যই পরে ত্বাওয়াফ করবেন। এই ত্বাওয়াফকে বলা হয় ত্বাওয়াফে ইফাযাহ্। এই

ত্বাওয়াফের সময় রামাল করবেন না অর্থাৎ ঘন ঘন পা ফেলে দ্রুত হাটবেন না। বরং স্বাভাবিকভাবে হাটবেন। এই ত্বাওয়াফের সময় ইযত্বিবা' অর্থাৎ চাদর ডান বগলের নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে তা বাম কাঁধের উপর রাখবেন না। এই ত্বাওয়াফ সম্পন্ন করার মাধ্যমেই আপনি পুরোপুরি হালাল হয়ে যাবেন।

১১) ত্বাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইবরাহীমের কাছে দু রাক্'আত সালাত আদায় করবেন। প্রথম রাক্'আতে ছুরা কাফিরূন আর দ্বিতীয় রাক্'আতে ছুরা ইখলাস পাঠ করবেন।

১২) তারপর আপনি যদি তামাত্তু' হাজ্জ পালনকারী হয়ে থাকেন তাহলে সাফা ও মারওয়ার মাঝে ৭ বার ছা'য়ী করবেন। ছা'য়ী শুরু করবেন সাফা পাহাড় থেকে আর শেষ করবেন মারওয়া পাহাড়ে। যাওয়া-আসায় মিলে হবে দু বার অর্থাৎ সাফা থেকে মারওয়ায় যাওয়া ১ চক্কর এবং সেখান থেকে সাফায় আসা ১ চক্কর বলে গণ্য হবে। এভাবে ৭ বার। মোট কথা সাফা থেকে মারওয়াহে ৪ বার যাবেন আর মারওয়া থেকে সাফায় ৩ বার আসবেন।

যখনই সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করবেন তখন প্রথমে কা'বার দিকে মুখ করে এ আয়াতটি পাঠ করবেন:- অর্থাৎ- নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র ﴿ﷻ﴾ নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত। (ছুরা বাক্বারাহ্- ১৫৮)

তারপর তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলবেন। এরপর বলবেন:- **"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু, আনজাযা ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা 'আব্‌দাহু ওয়া হাযামাল আহ্‌যাবা ওয়াহ্‌দাহু"**। এই বাক্যগুলো তিনবার বলবেন এবং নিজের দুন্‌ইয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আল্লাহ্‌র ﴿ﷻ﴾ নিকট কায়মনে দু'আ করবেন।

প্রতিবার সাফা ও মারওয়াতে আরোহণ করে এই একই নিয়ম পালন করবেন। সাফা থেকে স্বাভাবিকভাবে হেটে সবুজ বাতি পর্যন্ত আসুন, সেখান থেকে অপর সবুজ বাতি পর্যন্ত জায়গাটুকু দ্রুতপদে অতিক্রম করুন। তারপর আবার স্বাভাবিকভাবে হেটে মারওয়াতে আরোহণ করুন। মারওয়া হতে সাফায় ঠিক একই নিয়মে আসুন। চলার পথে আল্লাহ্‌র মহত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করুন, আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা ও রাহমাত প্রার্থনা করুন। আপনি যদি ক্বিরান বা ইফরাদ হাজ্জ পালনকারী হয়ে থাকেন এবং ইতিপূর্বে আপনি যদি সাফা ও মারওয়ায় ছা'য়ী সম্পন্ন না করে থাকেন, তাহলে উপরোক্ত নিয়মে আপনাকেও ছা'য়ী আদায় করতে হবে।

১৩) ছা'য়ী শেষ হলে পরে ইচ্ছে মতো যাম্‌যামের পানি পান করবেন, অসুবিধা না হলে মাথায়ও দেবেন।

১৪) সম্ভব হলে মাক্কায় যুহ্‌রের সালাত আদায় করবেন।

১৫) অতঃপর আবার মীনায় চলে যাবেন। সেখানে ১০ তারিখ দিবাগত রাত, ১১ তারিখ দিবাগত রাত এবং ১২ তারিখ দিবাগত রাত- এই তিন রাত যাপন করবেন। মনে রাখবেন ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহাজ্জ এই তিন দিন হলো আইয়্যামে তাশরীক্ব।

১১, ১২ ও ১৩ই যিলহাজ্জ

এই তিন দিনের প্রতিদিন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পর (অর্থাৎ যুহ্‌রের সালাতের সময় হয়ে যাওয়ার পর) তিনটি জাম্‌রাহ্‌তে (ছোট, মাঝারী ও বড়) ৭টি করে (চানা-বুটের থেকে সামান্য বড় সাইজের) পাথর নিক্ষেপ করবেন। খেয়াল রাখবেন প্রতিটি পাথরই যেন জামরাহ্‌তে আঘাত হানে। যেগুলো লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে সেগুলো পুনরায় নিক্ষেপ করবেন।

প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময় বলুন- "আল্লাহু আকবার"। **প্রথমে ছোট জামরাহ্‌ যেটি মাছজিদে খাইফের সন্নিকটে অবস্থিত** সেটিকে এক এক করে (একনাগাড়ে) সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবেন। পাথর নিক্ষেপ শেষ হলে পরে ডান পার্শ্বে একটু সামনে গিয়ে ক্বিবলাহ্‌মুখী হয়ে দাড়িয়ে একাকী দু'হাত তুলে মহান আল্লাহ্‌র কাছে বিনীতভাবে একাগ্রচিত্তে দু'আ করবেন।

অতঃপর দ্বিতীয় জামরায় এসে সেটিকেও পূর্বোক্ত নিয়মে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করুন। প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময় "আল্লাহু আকবার" বলুন। দ্বিতীয় জামরায় পাথর মারা শেষ হলে বাম পার্শ্বে একটু সামনে গিয়ে ক্বিলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে একাকী মহান আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করুন।

অতঃপর তৃতীয় জামরাহ্‌ তথা জামরায়ে 'আক্বাবাহ্‌-তে এসে সেটিকে সামনে রেখে এবং বাইতুল্লাহ্‌কে বাম পার্শ্বে আর মীনাকে ডান পার্শ্বে রেখে পূর্বোক্ত নিয়মে পাথর নিক্ষেপ করবেন। তবে এখানে পাথর নিক্ষেপ শেষে দাঁড়াবেন না বা দু'আ করতে যাবেন না।

যদি কেউ ১১ ও ১২ই যিলহাজ্জ এই দুই দিন পাথর মেরে (১২ই যিলহাজ্জ দিবাগত রাত মীনায় যাপন না করে এবং ১৩ই যিলহাজ্জ দিনে পাথর নিক্ষেপ না করে) চলে যায় তাহলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে উত্তম হলো আইয়্যামে তাশরীক্বের রাতগুলো মীনায় যাপন করা এবং পর পর তিন দিন পাথর নিক্ষেপ করা। তবে ১৩ই যিলহাজ্জ সূর্যাস্তের পূর্বে পাথর নিক্ষেপের কাজ শেষ করতে হবে।

মিনায় অবস্থানকালীন দিনগুলোতে জামা'আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্বত সালাত আদায় করা কর্তব্য। যদি সম্ভব হয় তাহলে মাছজিদে খাইফে পাঁচ ওয়াক্বত সালাত (যে কয়দিন থাকবেন) জামা'আতের সাথে আদায় করবেন। ত্বাবারানী ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে, রাছূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন যে, "খাইফের মাছজিদে সত্তর জন নাবী সালাত আদায় করেছেন"।

আইয়্যামে তাশরীক্বের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনে পাথর নিক্ষেপ শেষ হয়ে গেলে আপনার হাজ্জ সম্পন্ন হয়ে যাবে। অতঃপর আপনি মীনা ছেড়ে মাক্কায় চলে যাবেন। সেখানে যে কয়দিন অবস্থান করবেন, অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্বত সালাত জামা'আতের সাথে মাছজিদুল হারামে আদায়ের সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন।

সম্ভব হলে আরো দু-চারটি 'উমরাহ্‌ করবেন। তা না হলে বেশি বেশি সালাত, ত্বাওয়াফ এবং হাজারে আছওয়াদ ও রুক্‌নে ইয়ামা-নী স্পর্শ করার চেষ্টা করবেন। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে, হাজারে আছওয়াদ বা রুক্‌নে ইয়ামা-নী স্পর্শ করতে যেয়ে কিংবা মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে সালাত আদায় করতে যেয়ে অন্যকে যেন কষ্ট দেয়া না হয়। এছাড়া মাক্কায় অবস্থানকালীন বেশি বেশি যিক্‌র-আযকার এবং একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনায় যথাসম্ভব মাশগুল থাকবেন।

হাজ্জের ছফর শেষ করে দেশে ফিরে আসার আগে বাইতুল্লাহ্‌র বিদায়ী ত্বাওয়াফ করতে হবে। কেননা রাছূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- তোমাদের কেউ যেন শেষবারের মতো বাইতুল্লাহ্‌র ত্বাওয়াফ না করে রওয়ানা না হয়। (সাহীহ্ মুছলিম, আবূ দাউদ) মোটকথা, দেশে ফেরার আগে আপনার সর্বশেষ কাজ যেন হয় বাইতুল্লাহ্‌র ত্বাওয়াফ।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অনেক লোককেই দেখা যায়- তারা ত্বাওয়াফ শেষে বাইতুল্লাহ্‌র প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে পিছনে হেঁটে বাইতুল্লাহ্ থেকে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা সম্মান প্রদর্শনের শরী'য়ত সম্মত কোন পদ্ধতি আদৌ নয় বরং এটি একটি সুস্পষ্ট বিদ'আত। কেননা রাছূলুল্লাহ্‌ ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম তথা সালাফে সালিহীন ﴿رضي الله عنهم﴾ বাইতুল্লাহ্‌র সম্মান সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি ও অনুধাবন করেছেন এবং বাইতুল্লাহ্‌র প্রতি তারাই সবচেয়ে বেশি সম্মান প্রদর্শন করেছেন, অথচ তাদের কেউ বাইতুল্লাহ্ থেকে এভাবে পিছনে হেঁটে বেরিয়ে এসেছেন মর্মে কোন প্রমাণ নেই। **আর যেহেতু আল্লাহ্‌র ﴿ﷻ﴾ মহিমান্বিত, বরকতময় ও অতি সম্মানিত গৃহ থেকে পিছনে হেঁটে বেরিয়ে আসা- এটাকে ইছলাম সম্মান প্রদর্শন বলে গণ্য করে না বরং এ কাজকে বিদ'আত ও ভ্রষ্টতা বলে আখ্যায়িত করে, সুতরাং কোন পীর-বুযুর্গ বা মু'মিন অলী-আউলিয়ার ক্বরস্থান (যেটাকে আমাদের সমাজে মাযার বলা হয়) থেকে পিছনে হেঁটে বেরিয়ে আসা- এটা যে কত বড় জঘন্য বিদ'আত, ন্যূনতম বিবেক সম্পন্ন যে কোন লোক তা সহজেই অনুধাবন করতে পারবে।**

আপনি হাজ্জের ছফরকালীন কিংবা এমনিতেই কেবল মাছজিদে নাবাওয়ীতে সালাত আদায়ের জন্য যেতে (ছফর করতে) পারেন। আপনি যখন মাছজিদে নাবাওয়ীতে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মাদীনাহ্ মুনাওয়ারাহ্ যাবেন, তখন আপনি ক্বোবা মাছজিদেও সালাত আদায় করতে পারেন। আপনি সেখানে রাছূলুল্লাহ্‌ ﷺ এবং তাঁর মহান দুই সাথী আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা) এর ক্বরদ্বয়, মাক্বারাতুল বাক্বী' এবং উহুদের জিহাদে শহীদগণের ক্বরর যিয়ারত করতে পারবেন। সেখানে আপনি ক্বরবাসীদের জন্য দু'আ করবেন। **তবে সাবধান! তাদের কাছে কিছু প্রার্থনা করবেন না। কেননা প্রথমতঃ প্রার্থনা বা দু'আ হলো 'ইবাদত। আর 'ইবাদতের বিন্দুমাত্র আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য কারো উদ্দেশ্যে নিবেদন করা যাবে না। এটা হলো শির্‌ক।**

দ্বিতীয়তঃ মৃত ব্যক্তিগণ কারো কোন উপকার বা অপকার করার আদৌ কোন সাধ্য বা সামর্থ্য রাখেন না। বরং অনেক ক্ষেত্রে তারাই জীবিতদের থেকে দু'আ প্রত্যাশা করেন।

আমরা মহান আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন বাইতুল্লাহ্‌র সকল হাজীগণকে স্বীয় সন্তুষ্টি অনুযায়ী হাজ্জ আদায়ের তাওফীক্ব দান করেন। তিনি যেন তাদের হাজ্জকে পূণ্যময় হাজ্জ হিসেবে ক্বূবূল করেন, তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন, তাদের শ্রম ও চেষ্টাকে ক্বূবূল করেন। আল্লাহ রাব্বুল 'আ-লামীন আমাদের প্রত্যেককে তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী বারবার পবিত্র বাইতুল্লাহ্‌র হাজ্জ সম্পাদনের তাওফীক্ব দান করেন- আ-মী-ন।

সূত্র:- আল মিনহাজ ফী ইয়াওমিয়াতিল হা-জ্জ।

দলীল-প্রমাণসহ আরো বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:
www.eshodinshikhi.com / www.learnislaminbangla.com

জামা'আতে নামাযে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যখন ঠিকঠাক হয়ে যেতাম (সফগুলো যখন সোজা ও ঠিকঠাক করে নিতাম) তখন তিনি তাকবীর (তাকবীরে তাহ্‌রীমাহ্) বলতেন। (আবূ দাউদ -৬৬৫)

আনাছ ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন- অর্থ- ঠিকভাবে সোজা সমান্তরাল হয়ে দাড়াও! ঠিকভাবে সোজা সমান্তরাল হয়ে দাড়াও! ঠিকভাবে সোজা সমান্তরাল হয়ে দাড়াও! কেননা যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে আমার পশ্চাৎ থেকে তেমনি দেখতে পাই যেমনি আমি তোমাদেরকে সম্মুখ থেকে দেখি। (ছুনানে নাছায়ী- ৮৮৭)

'উমার ﵁ হতে বর্ণিত যে, তিনি নামাযের সফ সোজা ও ঠিকঠাক করার জন্য কিছু লোককে দায়িত্ব দিয়ে রাখতেন যতক্ষণ না তারা সফ পুরোপুরি ঠিকঠাক হয়েছে বলে তাকে অবগত করতেন, ততক্ষণ তিনি তাকবীর বলতেন না। (জামে' তিরমিযী- ১/৪৩৯। মুআত্তা ইমাম মালিক- ১৫৮। বাইহাক্বী- ২/২১)

মুসান্নাফু 'আব্দির্ রায্‌যাক্ব গ্রন্থে 'আব্দুল্লাহ্ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- অর্থ- 'উমার ﵁ নামাযে সফ সোজা; ঠিকঠাক না হওয়া পর্যন্ত তাকবীর (তাকবীরে তাহ্‌রীমাহ্) বলতেন না এবং সফ ঠিক করে দেয়ার জন্য কিছু লোককে তিনি দায়িত্ব দিয়ে রাখতেন। 'আলী এবং 'উছমানও (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা) তদ্রুপ করতেন। তাঁরা উভয়েই মুসাল্লীদের উদ্দেশ্য করে বলতেন- অর্থ- তোমরা সফ ঠিক করো। (জামে' তিরমিযী - ২২৭। মুআত্তা ইমাম মালিক- ১৫৮। মুসান্নাফু ইবনে আবী শাইবাহ্- ১/ ৩৫২। বাইহাক্বী- ২/২১-২২)

কোন কোন সাহাবী ﵃ ক্বাতার সোজা ও ঠিকঠাক করার জন্য প্রয়োজনে পায়ে বেত্রাঘাতও করতেন।

'উমার ﵁ সফ সোজা করতে যেয়ে আবূ 'উছমান আন নাহ্‌দীর পায়ে বেত্রাঘাত করেছেন। (আল মুহাল্লা লি ইবনে হায্‌ম)

ছুওয়াইদ ইবনু গাফলাহ্ ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- বিলাল ﵁ নামাযের সময় (সফ সোজা করার জন্য) আমাদের পায়ে বেত্রাঘাত করতেন এবং আমাদের কাঁধসমূহ সমান্তরাল করে দিতেন। (মুসান্নাফু 'আব্দির্ রায্‌যাক্ব-২৪৩৫)

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, নামাযে ক্বাতার সোজা-সঠিক করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম ﵃ এ বিষয়টিকে খুব বেশি গুরুত্ব প্রদান করতেন। একারণেই অনেক 'উলামায়ে কেরাম নামাযে ক্বাতার সোজা করা ওয়াজিব বলে অভিমত দিয়েছেন।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশে প্রায় সকল মাছজিদেই সম্মানিত ইমাম সাহেবগণ বেশি থেকে বেশি "ক্বাতার সোজা করুন, মোবাইল ফোন বন্ধ করুন" বলেই নিজ দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে বলে মনে করেন। ইমাম সাহেবগণ ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে থাকেন, ক্বাতার ঠিক হোক বা না হোক সময় হওয়ার সাথে সাথেই তাঁরা তাকবীরে তাহ্‌রীমাহ্ বলে নামায শুরু করে দেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, মাছজিদের নির্দিষ্ট সময়ে কেবল নামায শুরু করে দেয়াটাই তাদের উপর ওয়াজিব।

জুমু'আর সালাত এবং 'ঈদের সালাতেও সেই একই অবস্থা। ইমাম সাহেব দীর্ঘ সময় নিয়ে প্রথমে বাংলা খুত্‌বাহ্ দিতে থাকেন, অন্যদিকে জুমু'আহ্ পূর্ববর্তী ছুন্নাত সালাতের জন্য এতই সংক্ষিপ্ত সময় দেয়া হয় যে, ধীরে-স্থিরে চার রাকা'আত সালাত আদায় করা কঠিন হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে ইমাম সাহেব 'আরবী খুতবাহ্ দিতে শুরু করে দেন। 'ঈদের সালাতেও যেখানে খুতবাহ্ সালাতের পরে দেয়া ওয়াজিব, সেখানে দেখা যায় যে ইমাম সাহেব সালাতের আগেই বাংলায় খুতবাহ্ (ভাষণ) দিতে থাকেন। সালাত শুরু হওয়ার এক মিনিট পূর্ব পর্যন্ত তাঁর ভাষণ চলতে থাকে। হঠাৎ করে "নামায শুরু হচ্ছে, সফ সোজা করুন" বলে মানুষের বিরাট ক্বাফিলাহ্ (দল) কিছু বুঝে উঠার আগেই তাকবীর বলে নামায শুরু করে দেন। এদিকে দেখা যায় যে, সফ সোজা হওয়া তো দূরের কথা অসংখ্য লোক সফের বাইরে এলোমেলোভাবে যে যেভাবে পারেন নামাযে অংশগ্রহণের চেষ্টা করছেন। ইতোমধ্যে অনেকের হয়তো দু-তিনটি তাকবীরই বাদ পড়ে গেছে। ওদিকে ইমাম সাহেব যথাসময়ে সালাত শুরু করতে পেরে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলছেন।

আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, সাধারণ মুক্বতাদী কিংবা মাছজিদ পরিচালনা কমিটির কথা না হয় বাদই দিলাম, ইমাম সাহেবগণ কি জানেন না যে, জামা'আতের অর্থ ও তাৎপর্য কি? সফ সোজা করার অর্থ কি? জামা'আতে সালাত আদায় করার পিছনে কী হিকমাত বা প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে? জামা'আতে সালাত আদায়কালীন তাদের করণীয় কী? হাদীছে এ সময় কী করার নির্দেশ রয়েছে? রাছূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ﵃ তখন কী করতেন? তাঁরা কি নির্দিষ্ট সময় হলেই আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করে দিতেন, নাকি সর্বাগ্রে তাঁরা সফ সোজা করতেন? যদি এসব মৌলিক বিষয় কারো জানা না থাকে কিংবা জানা থাকলেও তা পালন ও বাস্তবায়নের মতো সৎ সাহস না থাকে, তাহলে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, সে লোক কোনভাবেই ইমাম হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

অজ্ঞতার কারণে আমাদের সমাজের বেশিরভাগ মুক্বতাদীগণও উপরোক্ত বিষয়ে চরম উদাসীন। **প্রায় প্রতিটি মাছজিদে জামা'আতকালীন ক্বাতারের (সফ বা লাইনের) অবস্থা দেখলে সহজেই বুঝা যায় যে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক হৃদ্যতা, আন্তরিকতা ও ঐক্যের কত অভাব। তারা কতই না বিশৃঙ্খল।** তাদের অনেকের দাড়ানোর অবস্থা দেখলে বুঝার উপায় নেই যে, তারা কি নামাযের জন্য দাড়িয়েছেন না অন্য কোন কাজের জন্য। পায়ের অবস্থান- সে তো এক পা আগে, আরেক পা পিছে। যেখানে নামাযে দাঁড়ানো কিংবা বসা সর্বাবস্থায় উভয় পায়ের অগ্রভাগ ক্বিবলামূখী থাকা আবশ্যক, সেখানে দেখা যায় যে, অধিকাংশেরই ডান পা উত্তরমূখী আর বাম পা দক্ষিণমূখী হয়ে আছে। এই যদি হয় প্রত্যেক মুক্বতাদীর দাড়ানোর অবস্থা, তাহলে সমবেত নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় তাদের সফ বা লাইনের চিত্র কেমন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

মুক্বতাদীগণের জানা উচিত যে, জামা'আতে সালাত আদায়কালীন পরস্পর কাঁধ সমান্তরাল রেখে এবং একে অপরের পায়ের গোড়ালির সাথে গোড়ালি মিলিয়ে মধ্যবর্তী ফাঁক-ফোকর বন্ধ করে সোজা-সঠিকভাবে ক্বিবলামূখী হয়ে দাঁড়ানো, এটা মূলত মুক্বতাদীগণেরই কাজ। ইমাম সাহেবের দায়িত্ব হলো বিষয়টি নিশ্চিত করা, প্রয়োজনে কঠোরতা আরোপ করা এবং সফ সোজা ও পুরোপুরি ঠিকঠাক না হওয়া পর্যন্ত সালাত শুরু না করা। শুধু তাই নয় বরং সালাত শুরুর পূর্বে, জুমু'আর খুতবায় কিংবা ধর্মীয় বিভিন্ন আলোচনা সভায় এতদ্বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে ক্বোরআন-ছুন্নাহ্‌র বিশুদ্ধ দলীল প্রমাণসহ সাধারণ মুছলমানকে অবহিত করা।

সফ ঠিক বা সোজা করা বলতে কি বুঝায়? রাছূলুল্লাহ্ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম ﵃ কিভাবে সফ ঠিক করতেন?

বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, সফ ঠিক করার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো নিম্নরূপ। রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম ﵃ "সফ সোজা করো" বলতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে বুঝতেন এবং বুঝাতেন।

(এক) সমান্তরাল হওয়া। আর এই সমান্তরাল দুই দিক থেকে হতে হবে। (ক) উপরের দিকে- কাঁধে কাঁধে। (খ) নিচের দিকে- পায়ে পায়ে। এর প্রমাণ হলো- আবূ মাছ'উদ ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- অর্থ- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের সময় আমাদের কাঁধ ছুঁয়ে দেখতেন আর বলতেন- সমান্তরাল হও, পরস্পর ভিন্নতা অবলম্বন করো না, নতুবা তোমাদের অন্তরও পরস্পর বিভক্ত-বিভেদপূর্ণ হয়ে যাবে। (সাহীহ্ মুছলিম -৪৩২। সাহীহ্ ইবনে হিব্বান -২১৬৯)

নু'মান ইবনু বাশীর ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- অর্থ- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ (সালাতে) আমাদের সফগুলো এমনভাবে সোজা করাতেন যেন তিনি এর দ্বারা কামানের কাঠ সোজা করছেন। যতক্ষণ না তিনি উপলব্ধি করলেন যে, আমরা তাঁর থেকে পুরোপুরি বুঝে গেছি। অতঃপর একদিন তিনি বেরিয়ে এসে সালাতে দাঁড়িয়ে তাকবীর দিতে যাবেন (তাকবীরে তাহ্‌রীমাহ্ বলে নামায শুরু করতে যাবেন) এমন সময় দেখলেন যে, এক ব্যক্তির বক্ষ সফ থেকে এগিয়ে আছে। তখন তিনি বললেন:- "আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌গণ! অবশ্যই তোমরা তোমাদের সফগুলো সোজা-সঠিক করে নিবে অন্যথায় আল্লাহ্ তোমাদের পরস্পরের চেহারায় (পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গি বা চিন্তাধারার মধ্যে) বিভেদ-মতানৈক্য সৃষ্টি করে দিবেন"। (সাহীহ্ বুখারী- ৭১৭। সাহীহ্ মুছলিম- ৪৩৬)

বারা ইবনু 'আযিব ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বক্ষ ও কাঁধ ছুঁয়ে ছুঁয়ে সফের একপ্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত অতিক্রম করতেন আর বলতেন:- পরস্পর ভিন্নতা অবলম্বন করো না, নতুবা তোমাদের অন্তরও পরস্পর বিভক্ত-বিভেদপূর্ণ হয়ে যাবে। তিনি (রাছূলুল্লাহ্ ﷺ) আরো বলতেন:- নিশ্চয় আল্লাহ প্রথম ক্বাতারসমূহের (মুসাল্লীদের) উপর রাহ্‌মাত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশতাহ্‌গণ তাদের জন্য রাহ্‌মাত প্রার্থনা করেন। (আবূ দাউদ)

মুছলিম উম্মাহ্ আজ শতধা বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন। তাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আর মতানৈক্যের কোন ইয়ত্তা নেই। এমনকি নামাযের রূপরেখা আর পদ্ধতি নিয়েও রয়েছে তাদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ। মুছলিম উম্মাহ্‌র এই বিভক্তি, বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্যের পিছনে যেসব কারণ রয়েছে, তন্মধ্যে উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত কারণটি হলো অন্যতম। তারা যদি রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর নির্দেশমত একে অন্যের কাঁধের সাথে কাঁধ সমান্তরাল রেখে পায়ের গোড়ালির সাথে গোড়ালি মিলিয়ে ক্বাতারগুলো সোজা-সঠিক করে ফাঁক-ফোকর বন্ধ করে শীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মিলিত হয়ে দাঁড়াত, তাহলে তাদের মধ্যে এতো অনৈক্য, বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হত না এবং তারা আল্লাহ্‌র ﷻ রাহ্‌মাত থেকেও বিচ্ছিন্ন হত না।

'আব্দুল্লাহ্ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন- অর্থ- তোমরা সফগুলো সোজা-সঠিক করো, পরস্পরের কাঁধ সমান্তরাল রেখো, ফাঁক-ফোকর বন্ধ করো, তোমাদের ভাইদের জন্য হাত নরম করো (কেউ যদি ক্বাতারে প্রবেশ করতে চায় তাহলে হাত শক্ত করে রেখো না যাতে সে ঢুকতে না পারে, বরং হাত নরম করে তাকে সফের ফাঁকে প্রবেশের সুযোগ দাও) এবং শয়তানের জন্য ছোট ছোট ফাঁকা জায়গা ছেড়ে দিও না। যে ব্যক্তি (নামাযে) ক্বাতার মিলিয়ে রাখে (ক্বাতারের ফাঁকা জায়গায় প্রবেশ করে ফাঁক

বন্ধ করে ক্বাতার মিলিয়ে রাখে) আল্লাহ ﷻ তাকে তাঁর (রাহ্মাতের) সাথে মিলিয়ে রাখেন। আর যে ব্যক্তি ক্বাতার বিচ্ছিন্ন করে, (সফের মধ্যে ফাঁকা জায়গা রেখে দেয়, যদ্দরুণ দু'জন মুসাল্লি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তদ্বারা সফও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়) আল্লাহ ﷻ তাকে তাঁর (রাহ্মাত) থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। (মুছনাদে ইমাম আহ্মাদ- ২/৯৭-৯৮। আবূ দাঊদ- ৬৬৬। নাছায়ী- ২/৯৩)

'আলী ইবনু আবী ত্বালিব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন- অর্থ- তোমরা (সালাতে) ঠিকভাবে সোজা-সমান্তরাল হয়ে দাঁড়াও তাহলে তোমাদের অন্তরও সোজা-সঠিক থাকবে এবং তোমরা গাদাগাদি করে মিলিত হয়ে দাঁড়াও তাহলে তোমাদের প্রতি রহম করা হবে। (ত্বাবারানী আওছাত্ব)

এখানে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার, তা হলো-প্রত্যেক মুসাল্লীকে সালাতে (একাকী হোক বা জামা'আতে) নিজের দু'পায়ের মাঝখানে এই পরিমাণ ফাঁক রেখে দাঁড়ানো উচিত, যাতে বসতে গিয়ে তাকে অতিরিক্ত জায়গা দখল করতে না হয় কিংবা অতিরিক্ত সংকুচিত হয়ে বসতে না হয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ শরীরের মাপ অনুযায়ী দু'পায়ের মাঝখানে স্বাভাবিক ফাঁক রেখে দাঁড়াবেন, যাতে বসার সময় ঐ জায়গাটুকুতে স্বাচ্ছন্দে বসতে পারেন। আমাদের দেশের মাছজিদগুলোতে দেখা যায় কোন কোন মুসাল্লি নিজের দু'পায়ের মাঝখানে মাত্র ৮/১০ আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রেখে খুব এঁটে-সেঁটে নামাযে দাঁড়ান, আবার কেউ কেউ নিজের ডান ও বাম পার্শ্বের মুসাল্লীর পায়ের সাথে পা মিলানোর জন্য তথা ফাঁক-ফোকর বন্ধ করার জন্য কিংবা এমনিতেই (এমনকি একাকী সালাতেও) নিজের পা দুটিকে অস্বাভাবিকভাবে (অনেক বেশি) প্রশস্ত করে দাঁড়ান। প্রকৃতপক্ষে দাঁড়ানোর এই উভয় পদ্ধতিই ছুন্নাহ্-সম্মত নয়। এভাবে দাঁড়ালে ছাজদাহ্ করার সময় এবং বসার সময় অন্যের জায়গা হয় দখল করতে হয়, নতুবা দু'জনের মাঝখানে অনেক জায়গা খালি পড়ে থাকে। অথচ এর কোনটাই কাম্য নয়।

(দুই) একজনের পায়ের গোড়ালির সাথে অপরজনের পায়ের গোঁড়ালি লাগিয়ে দুইজনের মধ্যকার ফাঁক-ফোকর বন্ধ করে শীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ক্বাতারবন্দি হওয়া। এর প্রমাণ হলো- আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন- অর্থ- তোমরা (সালাতে) ফাঁক-ফোকর বন্ধ করো। (আবূ দাঊদ- ৬৮১)

সাহীহ্ বুখারীতে আনাছ ইবনু মালিক ﷺ হতে বর্ণিত যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন- অর্থ- তোমরা তোমাদের সফগুলো ঠিকঠাক ও সোজা করে নাও, কেননা আমি তোমাদেরকে আমার পিছন দিক থেকেও দেখতে পাই। আনাছ ﷺ বলেন: (একথা শুনার সাথে সাথে) আমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ পার্শ্ববর্তী লোকের কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা খুব ভালো করে লাগিয়ে নিতাম। (সাহীহ্ বুখারী- ৬৯২)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে- নামাযের ইক্বামত হয়ে যাওয়ার পর রাছূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন- অর্থ- তোমরা তোমাদের সফগুলো ঠিক করো এবং শীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ফাঁক-ফোকর বন্ধ করো, কেননা আমি তোমাদেরকে আমার পিছন থেকেও দেখতে পাই। (সাহীহ্ বুখারী- ৬৮৬-৬৮৭। সাহীহ্ মুছলিম- ৪৩৪)

নু'মান ইবনু বাশীর ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- একদা রাছূলুল্লাহ্ ﷺ মানুষের (নামাযের জন্য উপস্থিত লোকদের) প্রতি মুখ ফিরিয়ে বললেন:- অর্থ- তোমরা সফ ঠিক করো, তোমরা সফ ঠিক করো, তোমরা সফ ঠিক করো। আল্লাহ্র শপথ! তোমরা অবশ্যই সফ ঠিক করবে অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের পরস্পরের অন্তরকে বিভক্ত করে দিবেন।

(আবূ দাঊদ- ৬৬২। সাহীহ্ ইবনে হিব্বান - ২১৭৩। সাহীহ্ ইবনে খুযাইমাহ্)

আবূ ছা'য়ীদ আল খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন- অর্থ- অতঃপর যখন তোমরা সালাতে দাঁড়াবে, তখন তোমরা তোমাদের সফগুলো সোজা সুদৃঢ় করো এবং ফাঁক-ফোঁকর বন্ধ করো, কেননা আমি তোমাদেরকে আমার পিছন থেকেও দেখতে পাই। (মুছনাদে ইমাম আহমাদ -১১০০৭। সাহীহ্ ইবনে খুযাইমাহ্ -১৫৪৮। সাহীহ্ ইবনে হিব্বান -৪০২)

এই ছিল সাহাবায়ে কেরামের (ﷺ) সালাতে দাঁড়ানোর নমুনা। আর আমাদের মাছজিদগুলোতে দেখা যায় এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। মুসাল্লীগণ তাদের পরস্পরের মধ্যে এত বিস্তর ফাঁক রেখে দাঁড়ান, দেখে মনে হয় যেন কেউ তাদের নির্দেশ দিচ্ছে যে, তোমরা পরস্পর নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখো, একজনের ছোঁয়া যেন অপরজেনর গায়ে না লাগে, কিংবা শয়তান তাদেরকে বলছে যে, আমি আসছি আমার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রেখো। তাছাড়া এই ফাঁকা জায়গায় কেউ প্রবেশ করতে চাইলে তারা প্রচন্ড বিরক্তিবোধ করেন এবং হাত শক্ত করে যথাসম্ভব তাকে বাঁধা দানের চেষ্টা করেন। নামাযে পায়ের সাথে পা এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলানোকে তারা রীতিমত দৃষ্টতা ও বে-আদবী বলে মনে করেন।

(তিন) একের পর এক সামনের সফগুলো পূরণ করে পর্যায়ক্রমে পিছনের সফগুলোতে আসা।

এর প্রমাণ হলো- জাবির ইবনু ছামুরাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদিন রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বেরিয়ে এসে আমাদেরকে বললেন:- অর্থ- ফিরিশতারা যেভাবে সারিবদ্ধ (সফবন্দী) হন তোমরা কেন সেভাবে সফবদ্ধ হও না? আমরা বললাম হে আল্লাহ্র রাছূল! ফিরিশতারা কিভাবে তাদের পালনকর্তার সামনে সফবদ্ধ হন? রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন:- তারা (প্রথমে) সামনের সফগুলো পূরণ করেন এবং শীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ফাঁক-ফোকর বন্ধ করে ক্বাতারে দাঁড়ান।

(সাহীহ্ মুছলিম- ৩৪০। ইবনু হিব্বান- ২১৫৯)

আনাছ ইবনু মালিক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- তোমরা সামনের সফ আগে পূরণ করো, তারপর তার পিছনের সফ (এভাবে পর্যায়ক্রমে সফগুলো) পূরণ করো। যাতে করে অপূর্ণতা যদি থাকে সেটা যেন সর্বশেষ সফেই থাকে। (আবূ দাঊদ- ৬৭১। নাছায়ী- ৮১৭)

সামনের সফে জায়গা খালি রেখে কেউ যদি পিছনের সফে দাড়ায় তাহলে প্রয়োজনে তার ঘাড় ডিঙিয়ে হলেও সামনের খালি জায়গা পূরণের অনুমতি হাদীছে রয়েছে।

ইবনু 'আব্বাছ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- যদি কেউ ক্বাতারে কোন খালি জায়গা দেখে, তাহলে সে নিজে থেকেই যেন তা পূর্ণ করে নেয়। যদি সে ব্যক্তি তা না করে, তাহলে (প্রয়োজনে) তার ঘাড়ে পা দিয়ে (হলেও) কেউ যেন ঐ খালি জায়গা পূরণ করতে যায়। কেননা তার কোন সম্মান নেই। (ত্বাবারানী)

আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- মানুষ যদি জানত আযানে এবং প্রথম ক্বাতারে কী ফযীলত রয়েছে অতঃপর তা অর্জনের জন্য যদি লটারীর প্রয়োজন হতো তাহলে তারা তা-ই করত। (সাহীহ্ বুখারী- ৪৩৭। সাহীহ্ মুছলিম)

কিন্তু আফছোছ! আমাদের সমাজে মুসাল্লীগণ নামায শেষে যাতে দ্রুত মাছজিদ থেকে বেরিয়ে আসা যায় তজ্জন্য তারা শেষ ক্বাতারে দাড়াতে এতই সচেষ্ট থাকেন, অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যেন প্রয়োজনে তারা এজন্য লটারী করতেও প্রস্তুত আছেন।

(চার) দুই সফের মধ্যে অযথা বেশি দূরত্ব না রাখা বরং এক সফ থেকে অন্য সফকে যতটুকু সম্ভব কাছাকাছি রাখা।

এর প্রমাণ হলো- **আনাছ ইবনু মালিক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন- অর্থ- তোমরা তোমাদের সফগুলোর ফাঁক-ফোকর বন্ধ করো এবং সফগুলো কাছাকাছি রেখো, কাঁধগুলো সমান্তরাল রেখো (এক বরাবর রেখো, কেউ আগে কেউ পিছে এমন হয়ো না)। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! নিশ্চয়ই আমি কালো রঙের লেজ ও কানবিহীন ছোট মেষ শাবকের ন্যায় শয়তানকে ক্বাতারের ফাঁক-ফোকর দিয়ে প্রবেশ করতে দেখছি।**

(আবূ দাঊদ- ৬৬৭। ইবনু হিব্বান- ২১৬৩। নাছায়ী- ৮৮৯)

মূলত ইমাম ও মুক্বতাদী মিলে যে সালাত আদায় করা হয় সেটাকে বলা হয় জামা'আত। ইজতিমা' শব্দ থেকে জামা'আত শব্দের অর্থ হলো- "সমবেত"-"একত্রিত"-"সম্মিলিত"-"ঐক্যবদ্ধ" ইত্যাদি। সুতরাং জামা'আতে নামাযের দাবি হলো ইমাম-মুক্বতাদী পরস্পর কাছাকাছি থাকা, মিলেমিশে থাকা, সম্মিলিত থাকা এবং বিচ্ছিন্ন না হওয়া। একারণে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ জামা'আতে সালাতের সফগুলো একদম কাছাকাছি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। অকারণে অপ্রয়োজনে জামা'আতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকা বা দূরত্ব বজায় রাখা এটা জামা'আতের অর্থ, তাৎপর্য ও উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থি কাজ। তাই ইমাম থেকে প্রথম ক্বাতার এবং পরবর্তী এক ক্বাতার থেকে অন্য ক্বাতারকে যতটুকু সম্ভব কাছাকাছি রাখা এবং দুই ক্বাতারের মধ্যখানে অনর্থক দূরত্ব বর্জন করা- এটাই হলো রাছূল ﷺ এর ছুন্নাহ্।

(পাঁচ) প্রাপ্তবয়স্ক, 'আলিম ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণ যথাসম্ভব ইমামের কাছাকাছি অবস্থান করা।

এর প্রমাণ হলো- 'আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাছ'ঊদ আল হুযালী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- তোমাদের মধ্য হতে জ্ঞানী-প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ-বুদ্ধিমান লোকেরা আমার কাছাকাছি দাড়াবে। অতঃপর (জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার দিক দিয়ে) যারা (যত বেশি) এদের কাছাকাছি, পর্যায়ক্রমে তারা দাড়াবে। (একথাটি রাছূলুল্লাহ্ ﷺ তিনবার বললেন) এবং তোমরা সাবধান! (মাছজিদে) বাজারের মতো শোরগোল করবে না। (সাহীহ্ মুছলিম- ৪৩২)

কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে প্রায় মাছজিদেই দেখা যায়; এমন সব লোকেরা ইমামের কাছাকাছি স্থানে অবস্থান করেন যারা ইমামের কোন সমস্যা হলে সে সমস্যা মুক্বাবিলা করার জ্ঞান রাখা তো দূরের কথা, অযূ বা সালাতের ফার্য-ওয়াজিব বিষয়েরও জ্ঞান রাখেন না, কিংবা যারা সাহীহ্-শুদ্ধভাবে ছূরায়ে ফাতিহাহ্ও তিলাওয়াত করতে পারেন না। মাছজিদ পরিচালনার দায়ভারও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের লোকের উপরই ন্যস্ত থাকে। অবশ্য এটা তাদের দোষ নয় বরং এজন্য অনেক ক্ষেত্রেই তারা প্রশংসার দাবিদার। কেননা সমাজের 'উলামায়ে কেরাম যারা এই মহান দায়িত্ব পালনের কথা, তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যাওয়ার কারণেই অন্যরা এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে বাধ্য হন।

অধিকাংশ 'আলিম ও ইমামগণ নিজেদের আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদা বেমালুম ভুলে যাওয়ার কারণে এবং ইমামতির ন্যায় একটি সুমহান ব্রতের মর্যাদা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য সঠিকভাবে উপলব্ধি না করার কারণেই সমাজে তারা আজ উপেক্ষিত এবং যথাযথ মূল্যায়ন ও মর্যাদা প্রাপ্তি থেকে চরমভাবে বঞ্চিত। দুঃখজনক হলেও সত্য,

বেশিরভাগ মাছজিদেই দেখা যায় যে, ইমাম সাহেব চাকরি হারানোর ভয়ে মাছজিদ পরিচালনা কমিটির কিংবা মুতাওয়াল্লি সাহেবের হুক্ম আর মর্জিমত ইমামতির দায়িত্ব পালন করছেন। এতে করে অনেক সময় জেনে-শুনে বিদ'আতী কাজ-কর্ম করতেও তারা দ্বিধাবোধ করেন না। এতদসত্ত্বেও তাদের অধিকাংশের ভাগ্যে একজন সাধারণ পিয়ন বা চৌকিদারের সমান বেতন জুটে না।

'আলিমগণ যদি সত্যিকার অর্থেই 'আলিম হতেন, তারা যদি কেবল আল্লাহ্কে (ﷻ) ভয় করে এবং একমাত্র তাঁর উপরই পূর্ণ আশা ও ভরসা রেখে চলতেন, তারা যদি নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতেন, তাহলে অবশ্যই তাদের এ করুণ দশা হতো না। অপরদিকে সাধারণ মুছলমান এবং বিশেষ করে মাছজিদ পরিচালনার সাথে জড়িত লোকেরা যদি এই সত্যটুকু উপলব্ধি করতেন যে, হাক্ব্যানী 'আলিমগণ হলেন নাবীগণের ('আলাইহিমুছ ছালাম) উত্তরসূরী, তাঁরা হলেন জাতির পরিচালক-কর্ণধার এবং মুক্তির দিশারী, তাহলে সমাজে 'উলামায়ে কেরাম বিদ্যমান থাকাবস্থায় দ্বীনী বিষয়ে অন্য কেউ নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব দেখাতে যেত না। ইমামের নিকটবর্তী স্থানটুকু জ্ঞানী-গুণী আহ্লে 'ইল্মদের জন্যই বরাদ্দ থাকত। সাধারণ মানুষ যদি একথা জানত যে, ইমামতি- এটা সাধারণ কোন দায়িত্ব বা পেশা নয়, এটা হলো নাবাওয়ী পেশা, এটা হলো এমন এক সুমহান ব্রত, যে ব্রতে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ দুন্ইয়া থেকে বিদায় নেয়ার আগ পর্যন্ত নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন, তাহলে তারা ইমামের পরামর্শ অনুযায়ী মাছজিদ পরিচালনা করত। তারা 'আলিম ও ইমামগণকে সমাজে সবচেয়ে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করত।

(ছয়) প্রথমে ডান দিক হতে সফ পূর্ণ করা। এর প্রমাণ হলো- বারা ইবনু 'আযিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:- অর্থ- আমরা যখন রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর পিছনে সালাত আদায় করতাম, আমরা তখন তাঁর ডানদিকে দাঁড়াতে পছন্দ করতাম। ছালাম ফিরানোর পর আমি তাকে বলতে শুনেছি- "রাব্বী ক্বিনী 'আযাবাকা ইয়াওমা তাব'আছু 'ইবাদাকা" (অর্থ- হে আমার প্রতিপালক! যে দিন তুমি তোমার বান্দাহ্দেরকে বিচারের জন্য উঠাবে, সেদিন আমাকে তোমার 'আযাব হতে রক্ষা করো।) {আবূ দাউদ। নাছায়ী}

সাহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ ইবনু 'আব্বাছকে (رضي الله عنه) সালাতে তাঁর বামপার্শ্ব হতে ডান পার্শ্বে নিয়ে এসেছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইমামের সাথে দাঁড়ানো মুক্তাদীর জন্য উত্তম স্থান হলো ইমামের ডানপার্শ্ব। নতুবা রাছূলুল্লাহ্ ﷺ ইবনু 'আব্বাছকে (رضي الله عنه) তাঁর বাম পার্শ্ব হতে ডানপার্শ্বে নিয়ে আসতেন না।

'আ-য়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- নিশ্চয়ই আল্লাহ (নামাযে) সফসমূহের ডানদিকে অবস্থানকারীদের উপর রাহ্মাত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশতাগণও তাদের জন্য (আল্লাহ্র কাছে) রাহমাত প্রার্থনা করেন। (আবূ দাউদ)

ডানদিক হতে সফ পূর্ণ করার অর্থ এই নয় যে, ইমামের ঠিক পিছনের জায়গাটুকু সহ ইমামের ডান-বাম খালি রেখে মাছজিদের একদম ডান প্রান্ত থেকে সফ শুরু করা। বরং এর অর্থ হলো ইমামকে মধ্যখানে রেখে প্রথমে তাঁর ডান পার্শ্বে তারপর বামপার্শ্বে দাঁড়াতে হবে। উদাহরণস্বরূপ- যদি ইমামের ডানে ও বামে পাঁচজন পাঁচজন করে মোট ১০ জন মুক্তাদী হয়ে যান, তাহলে ১১ নং মুক্তাদীর জন্য উচিত হলো- ইমামের ডানপার্শ্বে দন্ডায়মান পূর্ববর্তী ৫ জনের ডানপার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ানো। আর মুক্তাদী যদি মাত্র ১জন হয় তাহলে তাকে অবশ্যই ইমামের সাথে একই বরাবরে ডানপার্শ্বে দাঁড়াতে হবে।

(সাত) মহিলাদেরকে পুরুষদের একদম পিছনে পৃথকভাবে পৃথক সারিতে রাখা। কোনভাবেই যেন সালাতে পুরুষ ও মহিলার সংমিশ্রণ না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা। এর প্রমাণ হলো- আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- পুরুষদের জন্য উত্তম সফ হলো প্রথম সফ এবং তাদের জন্য মন্দ সফ হলো একদম পিছনের সফ। আর মহিলাদের জন্য উত্তম সফ হলো সর্বশেষ সফ এবং তাদের জন্য মন্দ সফ হলো প্রথম সফ।

(সাহীহ্ মুছলিম- ৪৪০। মুছনাদে আহ্মাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাছায়ী)

মহিলা যদি মাত্র একজনও হয় তবুও তাকে পুরুষের সারিতে নিয়ে আসা যাবে না। বরং তাকে পিছনে এবং পৃথক সারিতে দাঁড়াতে হবে।

আমাদের দেশের বর্তমান যে সমাজ ব্যবস্থা এবং আমাদের সমাজের যে বেহাল দশা, এতে মহিলাদের মাছজিদে না যেয়ে বরং নিজ নিজ গৃহে সালাত আদায় করা আবশ্যক। তাছাড়া এমনিতেই তো মহিলাদের জন্য মাছজিদের পরিবর্তে নিজ নিজ ঘরে সালাত আদায় করা উত্তম। যেমন- উম্মু ছালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- মহিলাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম মাছজিদ হলো তাদের গৃহাভ্যন্তর। (মুছনাদে ইমাম আহ্মাদ- ২৬০০২)

তবে হ্যাঁ, যদি পূর্ণ পর্দার সাথে মহিলাদের মাছজিদে আসা-যাওয়া, তাদের নিরাপত্তা এবং পুরুষ-মহিলার সংমিশ্রণ না হওয়া নিশ্চিত করা সম্ভব হয়, তাহলে মহিলাদেরকে জামা'আতে সালাত আদায়ের জন্য মাছজিদে আসা থেকে বারণ করা যাবে না।

সালাতে সফ ঠিক বা সোজা করা বলতে উপরোক্ত সাতটি বিষয়কে একসাথে নিশ্চিত করা বুঝায়। যদি এ সাতটি বিষয়ের মধ্য হতে যে কোন একটি বিষয়ও সালাতের জামা'আতে বাদ পড়ে, তাহলে সেই সালাত সঠিকভাবে ও পরিপূর্ণরূপে আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে না এবং এর দ্বারা জামা'আতে সালাতের কাঙ্খিত ফযীলত লাভেরও আশা করা যায় না। তাই ইমাম এবং মুক্তাদী; আমাদের প্রত্যেকেরই সালাতে সফ তথা ক্বাতারবন্দী হওয়ার বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক ও যত্নবান হওয়া একান্ত আবশ্যক।

দলীল-প্রমাণসহ আরো বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:
www.eshodinshikhi.com / www.learnislaminbangla.com

ক্বোরবানীর তাৎপর্য

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করার পর বলে যে "এ পশুটি আমি ক্বোরবানী দেয়ার জন্য ক্রয় করেছি" কিংবা "এটি আমার ক্বোরবানীর পশু" তাহলে নির্ধারিত সেই পশুটি ক্বোরবানী করা তার উপর ওয়াজিব, এ বিষয়েও আয়িম্ম্যায়ে কেরামের কারো কোন দ্বিমত নেই। রাছূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্র (ﷻ) নৈকট্য কামনায় মুক্বীম এবং মুছাফির সর্বাবস্থায় প্রত্যেক বছর (মাদানী জীবনের দশ বছর) ক্বোরবানী করেছেন।

ক্বোরবানী বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী:-

ক্বোরবানী সঠিক-শুদ্ধ হওয়ার জন্য ৬টি শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে যদি একটি শর্তও না পাওয়া যায়, তাহলে ক্বোরবানী সঠিক ও বিশুদ্ধ হবে না তথা ক্বোরবানী আদায় হবে না।

শর্ত ৬টি হলো, যথা:-

১) নিম্নলিখিত যে কোন প্রকার গবাদীপশু হতে হবে- (ক) উট (খ) গরু (গ) ছাগল (ঘ) ভেড়া বা দুম্বা। এগুলোর নর বা মাদি।

২) ক্বোরবানীর পশুটি শরী'য়ত নির্ধারিত বয়সী হতে হবে। আর তা হলো:- ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা- এক বছর পূর্ণকারী এবং ২য় বছরে পদার্পণকারী হতে হবে।

গরু- দুই বছর পূর্ণকারী এবং ৩য় বছরে পদার্পণকারী হতে হবে।

উট- পাঁচ বছর পূর্ণকারী এবং ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী হতে হবে।

মোটকথা, উট হোক কিংবা গরু, ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা এগুলোর নর বা মাদি যা-ই হোক না কেন, অবশ্যই সেটাকে কমপক্ষে মূল (দুধ দাঁত নয়) দুই দাঁত বিশিষ্ট হতে হবে। কেননা উপরে উল্লেখিত বয়স হলেই এই দাঁত দুটি গজায়।

তবে ক্বোরবানীর বয়স পূর্ণ হওয়ার পরেও যদি পশুটির দাঁত না গজায় এবং তার ক্বোরবানীর বয়স পূর্ণ হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়, তাহলে এক্ষেত্রে ঐরূপ পশু দিয়ে ক্বোরবানী আদায় করা জায়িয। তাতে আল্লাহ চাহেতো কোন অসুবিধা নেই।

৩) ক্বোরবানীর পশুটি নিম্নোক্ত ত্রুটিসমূহ হতে মুক্ত হতে হবে-

(ক) স্পষ্ট কানা। আর তা দুই চোঁখ হোক বা এক চোঁখ, বাহ্যত: চোঁখ থাকুক বা না-ই থাকুক। মোটকথা, পশুটির অন্ধত্ব যদি স্পষ্ট হয়, তাহলে এমন পশু দিয়ে ক্বোরবানী জায়িয হবে না। কিন্তু যদি স্পষ্ট কানা না হয়, যেমন চোঁখের যৎসামান্য অংশ (চার বা তিনভাগের একভাগ) যদি সাদা হয়ে যায় কিংবা তার অন্ধত্ব প্রকাশ না পায়, পশুটি যদি স্বাভাবিকভাবে চলা-ফেরা করতে পারে, তাহলে এরূপ পশু ক্বোরবানী করা জায়িয।

(খ) স্পষ্ট খোঁড়া বা লেংড়া। অর্থাৎ যে পশুটি তার স্বাভাবিক চলা-ফেরা করতে পারে না। মাঠে-পথে তার স্বজাতি অন্যান্য সুস্থ পশুদের সাথে একসাথে হাটা-চলা করতে অক্ষম, এমন পশু ক্বোরবানী করা জায়িয নয়। তবে হ্যাঁ, খোঁড়ামী যদি স্পষ্ট না হয়; তা যদি প্রকাশ না পায়, যেমন- পশুটি তার পায়ে কিছুটা সমস্যা থাকা সত্ত্বেও মোটামুটি স্বাভাবিকভাবে স্বজাতি অন্যান্য সুস্থ পশুদের সাথে হাটা-চলা করতে পারে, তাদের সাথে ঘুরে-ফিরে খেতে পারে, তাহলে এরূপ পশু ক্বোরবানী করা জায়িয।

(গ) স্পষ্ট রোগী। অর্থাৎ যে পশুটির মধ্যে রোগের ছাঁপ স্পষ্ট, দেখেই বুঝা যায় যে, পশুটি রোগাক্রান্ত। যেমন- প্রচন্ড দুর্বল, নিস্তেজ, প্রচন্ড জ্বরে বা কাশিতে আক্রান্ত যদ্দরুণ চলে-ফিরে খেতে পারছেনা কিংবা খাওয়ার রুচি হারিয়ে ফেলেছে, অথবা শরীরে এমন ঘা, পচন বা চর্মরোগ দেখা দিয়েছে যা তার গোশ্তকে আক্রান্ত করে ফেলেছে অথবা তার শরীর-স্বাস্থ্যকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে ফেলেছে। এরকম পশু দ্বারা ক্বোরবানী জায়িয নয়। তবে যদি তার রোগ স্পষ্ট বা প্রকাশিত না হয়, যেমন- বাহ্যিকভাবে পশুটিকে দেখে রোগগ্রস্থ বলে মনে না হয় কিংবা সাধারণ এমন কোন রোগ হয় যেটি পশুর শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য তেমন ক্ষতিকর নয়, তাহলে এরকম পশু দ্বারা ক্বোরবানী করা জায়িয।

(ঘ) প্রচন্ড জীর্ণশীর্ণ হাড্ডিসার। অর্থাৎ যে পশুটি অতিশয় জীর্ণশীর্ণ, শরীরে গোশ্ত নেই বললেই চলে। এরকম পশু দ্বারা ক্বোরবানী জায়িয নয়।

উপরোক্ত চার প্রকারের যে কোন প্রকার ত্রুটিযুক্ত পশু দ্বারা ক্বোরবানী জায়িয নয়। এর প্রমাণ হলো- **বারা ইবনু 'আযিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা রাছূলুল্লাহ্ ﷺ খুতবাহ্ দিতে আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন, অতঃপর তিনি বললেন:- অর্থ- ক্বোরবানীর ক্ষেত্রে চার প্রকার পশু দ্বারা ক্বোরবানী জায়িয নয়- স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট রোগগ্রস্থ এবং অতিশয় জীর্ণশীর্ণ; হাড্ডিসার।** (তিরমিযী- ১৪৯৭। আবূ দাউদ- ২৮০২। ইবনু মাজাহ্- ৩১৪৪)

মুআত্তা ইমাম মালিক গ্রন্থেও বারা ইবনু 'আযিব (رضي الله عنه) থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

যেহেতু এসকল হাদীছে উল্লেখিত চার প্রকার ত্রুটিযুক্ত পশু ক্বোরবানী করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, সুতরাং এর চেয়ে মারাত্মক ও বেশি ত্রুটিযুক্ত পশু ক্বোরবানী করা

যে নিষিদ্ধ- তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমন খোঁড়ার স্থলে যদি পশুটির এক হাত অথবা এক পা কাটা হয় বা ভাঙ্গা হয় কিংবা কোমর ভাঙ্গা হয় যদ্দরুণ পিছন দিক উঠাতে পারে না, তাহলে এরূপ পশু দ্বারা ক্বোরবানী জায়িয হবে না। এ ব্যাপারে আয়িম্মায়ে কেরামের কারো কোন দ্বিমত নেই। অনেক 'উলামায়ে কেরামের মতে উল্লেখিত চার প্রকার ত্রুটির সমান তথা সমপর্যায়ের অন্যান্য ত্রুটিযুক্ত পশু দ্বারাও ক্বোরবানী জায়িয নয়। পক্ষান্তরে এই চার প্রকার ত্রুটির অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ছোটখাঁটো ত্রুটি বা খুঁত যা পশুর শরীর-স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয় কিংবা তার মোটা-তাজা হওয়ার পিছে অন্তরায় নয় অথবা তার মূল্য হ্রাসের কারণ নয়, এরূপ কোন দোষ-ত্রুটিযুক্ত পশু ক্বোরবানী করা জায়িয। এ বিষয়ে আয়িম্মাহ্ ও 'উলামায়ে কেরামের কারো কোন দ্বিমত নেই। যেমন- কানের সামান্য অংশ কাটা বা ছিদ্রযুক্ত পশু, কম লোম বিশিষ্ট পশু, শিংয়ের উপরের খোসা উঠে যাওয়া পশু, শিংয়ের অগ্রভাগের কিয়দাংশ বা এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ ভেঙ্গে যাওয়া পশু দ্বারা ক্বোরবানী আদায় করা জায়িয তথা বৈধ রয়েছে। তবে প্রত্যেক ক্বোরবানীদাতাকে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, সুন্দর, সুঠাম, হৃষ্টপুষ্ট ও নিখুঁত পশু ক্বোরবানী করাই হলো সবচেয়ে উত্তম।

অনেক পশুর গায়ে ছোট ছোট গ্লান্ড দেখা যায়, এটা আসলে ধর্তব্য কোন রোগ বা ত্রুটি নয়, এরূপ পশু ক্বোরবানী করা জায়িয তথা বৈধ রয়েছে। তবে হ্যাঁ, গ্লান্ডের কারণে যদি পশুর শরীর-স্বাস্থ্যের কোনরূপ ক্ষতি হয়ে থাকে, কিংবা গ্লান্ডের কারণে পশুটির গোশ্ত যদি মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকে, তাহলে এরূপ পশু দ্বারা ক্বোরবানী জায়িয নয়। আর যদি সাধারণ কোন টিউমার হয়ে থাকে তাহলে এরূপ পশু দিয়ে ক্বোরবানী দেয়া যদিও জায়িয রয়েছে, তবে তা মাকরূহ। মল-মূত্র বন্ধ হয়ে যে পশুটির পেট ফুলে বা ফেঁপে গেছে এমন পশু শঙ্কামুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তদ্বারা ক্বোরবানী করা জায়িয নয়।

উপর থেকে পড়ে গিয়ে কিংবা অন্য কোন কারণে যে পশুটির মরণাপন্ন অবস্থা, এমন পশু দিয়ে ক্বোরবানী জায়িয নয় যতক্ষণ না সেটি শঙ্কামুক্ত হবে।

৪) ক্বোরবানী সঠিক-শুদ্ধ হওয়ার জন্য চতুর্থ শর্ত হলো- ক্বোরবানী দাতাকে অবশ্যই ক্বোরবানীর জন্য নির্ধারিত পশুটির বৈধ মালিক হতে হবে অথবা বৈধ মালিকের কিংবা শরী'য়তের পক্ষ হতে যথাযথ অনুমতিপ্রাপ্ত হতে হবে। চুরিকৃত, ছিনতাইকৃত, অন্যায় বা মিথ্যা দাবির মাধ্যমে গৃহীত পশুর দ্বারা ক্বোরবানী জায়িয হবে না। কেননা আল্লাহ্র (ﷻ) নাফরমানীর মাধ্যমে তো তাঁর নৈকট্য বা সন্তুষ্টি লাভ করা যায় না।

কোন ইয়াতীম যদি পর্যাপ্ত সম্পদের মালিক হয়ে থাকে এবং ক্বোরবানী না দিলে যদি তার মন ভেঙে পড়ে অর্থাৎ দুঃখবোধ করে, তাহলে এমতাবস্থায় ইয়াতীমের অভিভাবক তার অনুমতি সাপেক্ষে ক্বোরবানী দিতে পারবেন।

৫) ক্বোরবানীর পশুটির মধ্যে অন্য লোকের অধিকার যেন সম্পৃক্ত বা সংযুক্ত না থাকে। অর্থাৎ পশুটি যেন কারো কাছে দায়বদ্ধ কিংবা কারো কাছ থেকে বন্ধক নেয়া অথবা কারো নিকট বন্ধক দেয়া না হয়।

উপরোক্ত ৫টি শর্ত কেবল ক্বোরবানীর পশুর ক্ষেত্রেই নয়; হাজ্জে তামাত্তু' বা হাজ্জে ক্বিরানের হাদইয়ু এবং 'আক্বীক্বার পশুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৬) ক্বোরবানীর পশু অবশ্যই শরী'য়ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ক্বোরবানী করতে হবে। অর্থাৎ ১০ই যিলহাজ্জ 'ঈদের সালাতের পর থেকে (যে শহরে বা এলাকায় একাধিক 'ঈদের সালাতের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, সেখানে প্রথম জামা'আত সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর থেকে) আয়িম্মাহ্ ও 'উলামায়ে কেরামের কারো কারো মতে ১২ই যিলহাজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত আর কারো কারো মতে ১৩ই যিলহাজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ক্বোরবানী করতে হবে। এই সময়ের আগে বা পরে ক্বোরবানী করলে ক্বোরবানী আদায় হবে না। **বারা ইবনু 'আযিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, রাছূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন:- অর্থ- যে ব্যক্তি 'ঈদের সালাতের পূর্বে যবেহ করবে, তাহলে সেটা হবে নিজের পরিবারের খাবারের জন্য পেশকৃত গোশত। এতে ক্বোরবানীর আদৌ কিছু নেই (অর্থাৎ এটা আদৌ ক্বোরবানী হিসেবে গণ্য হবে না)। {সাহীহ্ বুখারী- ৫৫৪৫। সাহীহ্ মুছলিম- ১৯৬১}**

সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছলিমে জুনদুব ইবনু ছুফইয়ান আল বুজালী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, রাছূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন:- অর্থ- সালাতের ('ঈদের সালাতের) পূর্বে যে ব্যক্তি যবেহ্ করবে, সে যেন তদস্থলে অন্য একটি পশু ক্বোরবানী করে।

(সাহীহ্ বুখারী- ২৫৬২। সাহীহ্ মুছলিম- ১৯৬০)

আনাছ ইবনু মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাছূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন:- অর্থ- যে ব্যক্তি নামাযের পূর্বে ('ঈদের নামাযের পূর্বে) যবেহ্ করল সে তা নিজের জন্য যবেহ্ করল। আর যে ব্যক্তি নামাযের পরে যবেহ্ করল, তার ক্বোরবানী পূর্ণ হলো এবং সে মুছলমানদের পথ সঠিকভাবে অনুসরণ করল। (সাহীহ্ বুখারী- ৫৫৪৫, ৫৫৪৬)

উপরোক্ত হাদীছসমূহ দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, 'ঈদের সালাতের আগে ক্বোরবানী করলে তা আদায় হবে না বরং পুনরায় ক্বোরবানী করতে হবে। তবে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল যেখানে 'ঈদের জামা'আতের কোন ব্যবস্থা নেই, সেসব এলাকায় সূর্য উদয়ের পর 'ঈদের সালাত আদায় করা যায় এই পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর ক্বোরবানী করা জায়িয।

ক্বোরবানীর শেষ সময় ১২ই যিলহাজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত মোট তিন দিন না ১৩ই যিলহাজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত মোট চার দিন, এ বিষয়ে যদিও 'উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে, তবে ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্র দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে ৪ দিনের পক্ষে মতটিই অধিকতর শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত। কেননা ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ (ﷻ) ইরশাদ করেছেন:- অর্থ- এবং নির্ধারিত দিনসমূহে আল্লাহ্কে স্মরণ করো।

(ছূরা আল বাক্বারাহ্- ২০৩)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:- অর্থ- যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ পশু হতে যা রিয্ক্ব হিসেবে দান করেছেন, সেগুলোর উপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করতে পারে।

(ছূরা আল হাজ্জ- ২৮)

নুবাইশাহ্ আল হুযালী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাছূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন:- অর্থ- তাশরীক্বের দিনগুলো হলো খানা-পিনা ও আল্লাহ্র যিক্র তথা আল্লাহ্কে স্মরণ করার দিন। (সাহীহ্ মুছলিম- ১১৪১)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় ও হাদীছে আল্লাহ্কে স্মরণ করার মধ্যে পশু জবাইকালীন আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা তথা আল্লাহ্র নামে পশু যবেহ্ করাও অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া যেহেতু রাছূলুল্লাহ্ (ﷺ) এর উপরোক্ত হাদীছের ভিত্তিতে সকল আয়িম্যায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে- আইয়্যামে তাশরীক্বের দিনগুলোতে রোযা রাখা হারাম, তাই এ বিষয়টিও ৪ দিনব্যাপী ক্বোরবানী জায়িয হওয়ার মতামতকে জোরালোভাবে সমর্থন করে। তবে প্রথম দিন অর্থাৎ ১০ই যিলহাজ্জ 'ঈদের সালাত খুতবাহ্সহ সম্পন্ন হওয়ার পর ক্বোরবানী করাই যে সবচেয়ে শ্রেয় এবং তৎপরবর্তী দিনগুলোর পর্যায়ক্রমে পরের দিনের চেয়ে আগের দিন (যেমন- ১২ তারিখের চেয়ে ১১ তারিখ) ক্বোরবানী করা উত্তম, এ বিষয়ে আয়িম্যায়ে কেরামের কারো কোন দ্বিমত নেই। এমনিভাবে রাতের চেয়ে দিনের বেলা ক্বোরবানী করাটাই যে উত্তম এবং ৯ই যিলহাজ্জ দিবাগত রাতে এবং ১৩ই যিলহাজ্জ দিবাগত রাতে ক্বোরবানী করলে তা যে আদায় হবে না, এতদ্বিষয়েও আয়িম্যায়ে কেরামের কারো কোন দ্বিমত নেই।

যাই হোক, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্বোরবানী দেয়ার এই শর্তটি কেবল ক্বোরবানীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, 'আক্বীক্বাহ্ বা হাদ্ইয়ু ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ক্বোরবানীর জন্য সবচেয়ে উত্তম হলো উট, এরপর গরু, এরপর দুম্বা-ছাগল বা ভেড়া। তারপর উটের এক-সপ্তমাংশ, এরপর গরুর এক-সপ্তমাংশ। আর এসবের নারী প্রজাতি থেকে পুরুষ প্রজাতি হলো উত্তম। সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছলিমে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, জুমু'আর সালাতের জন্য দ্রুত গমনকারীদের সম্পর্কে রাছূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন:- অর্থ- যে ব্যক্তি জুমু'আর প্রথম মূহুর্তে গমন করল সে যেন একটি উট ক্বোরবানী করল, যে ব্যক্তি জুমু'আর দ্বিতীয় মূহুর্তে গমন করল সে যেন একটি গরু ক্বোরবানী করল, আর যে ব্যক্তি জুমু'আর তৃতীয় মূহুর্তে তথা তৃতীয় ভাগে গমন করল সে যেন একটি ছাগল ক্বোরবানী করল।

(সাহীহ্ বুখারী- ৮৮১। সাহীহ্ মুছলিম- ৮৫০)

এই হাদীছ দ্বারা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, গরু থেকে উট উত্তম এবং ছাগল থেকে গরু উত্তম। আর যেহেতু গরু থেকে উট উত্তম সুতরাং গরুর এক-সপ্তমাংশ থেকে উটের এক-সপ্তমাংশ উত্তম হবে, এটাই স্বাভাবিক।

উট, গরু, ছাগল এই তিন প্রজাতির মধ্যে যেটি বেশি দামী, মোটা-তাজা, দেখতে সুন্দর ও নিখুঁত হবে, ঐ প্রজাতির মধ্যে সেটিই হবে সবচেয়ে উত্তম। যেমন- যে উটটি বেশি দামী, মোটা-তাজা ও নিখুঁত হবে, উটের মধ্যে সেটিই হবে সবচেয়ে উত্তম। এমনিভাবে গরু-ছাগল-ভেড়ী বা দুম্বার মধ্যে যেটি বেশি দামী, মোটা-তাজা ও নিখুঁত হবে, এ প্রজাতির পশুর মধ্যে সেটিই হবে ক্বোরবানীর জন্য সবচেয়ে উত্তম। আবূ রাফে' (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:- অর্থ- রাছূলুল্লাহ্ (ﷺ) যখন ক্বোরবানী করতে যেতেন, তখন তিনি দু'টি মোটা-তাজা মেষ (দুম্বা) ক্রয় করতেন।

(মুছনাদে ইমাম আহ্মাদ- ৬/২২০। ইবনু মাজাহ্- ৩১২২)

ক্বোরবানী সংক্রান্ত অত্যন্ত জরুরী কয়েকটি মাছায়িল:-

১) বেশি মূল্যে ক্বোরবানীর জন্য একটি পশু কেনার চেয়ে সম্ভব হলে ঐ একই দামে একই প্রজাতির একাধিক পশু ক্বোরবানী করা উত্তম (তবে সর্বাবস্থায় খেয়াল রাখতে হবে- পশুটি যেন ত্রুটিমুক্ত হয়)। কেননা একাধিক ক্বোরবানীর দ্বারা অধিক এবং একাধিকবার রক্ত প্রবাহিত করা হয়ে থাকে। তবে সাতটি ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা ক্বোরবানীর চেয়ে একটি উট বা গরু ক্বোরবানী করা উত্তম। কেননা এগুলোর সাতটি হলো একটি উট বা গরুর সমান, আর পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, ক্বোরবানীর জন্য সবচেয়ে উত্তম হলো উট, এরপর গরু, তারপর দুম্বা, ছাগল ও ভেড়া।

এমনিভাবে প্রত্যেক প্রজাতির পশুর মধ্যে উত্তম জাতের পশু ক্বোরবানী করা হলো সর্বোত্তম। যেমন- উটের মধ্যে দামী ভালো জাতের উট, তদ্রূপ গরু-ছাগল-ভেড়া-দুম্বা ইত্যাদির মধ্যেও ভালো জাতের দামী পশু ক্বোরবানী করা সবচেয়ে উত্তম।

২) ক্বোরবানীর জন্য নিখুঁত ও নির্দোষ পশু কেনার পর যদি তাতে এমন কোন ত্রুটি বা দোষ দেখা দেয়, যে দোষ বা ত্রুটি সম্বলিত পশু ক্বোরবানী করা জায়িয নয়, মোটকথা যদি পশুটি ক্বোরবানীর অনুপযোগী হয়ে যায়, যেমন- একটি ভালো উট, গরু, দুম্বা, ছাগল বা ভেড়া কেনার পর যদি সেটি অন্ধ, খোঁড়া বা অচল হয়ে যায় কিংবা পা ভেঙে যায়, তাহলে এক্ষেত্রে এর কারণ খুঁজে দেখতে হবে। **যদি দেখা যায় যে, ক্বোরবানী দাতার অবহেলা বা গাফলতির কারণে কিংবা তার সুস্পষ্ট ভুলের কারণে এমনটি হয়েছে, তাহলে উক্ত পশু দ্বারা ক্বোরবানী আদায় হবে না, বরং এর**

স্থলে তাকে একই প্রজাতির সমমূল্যের অন্য একটি পশু ক্বোরবানী করতে হবে। কেননা, ক্বোরবানীর পশু ক্রয় করার পর ক্রেতা তথা ক্বোরবানী দাতা সেটির আমানতদার ও যিম্মাহদার হয়ে যান। সুতরাং তার যিম্মায় থাকাকালীন যদি পশুটি তার অবহেলা বা ভুলের কারণে ক্রটিযুক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে অবশ্যই তাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। **তবে এ বিধানটি কেবল ওয়াজিব ক্বোরবানীর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।** আর যদি মুছ্তাহাব ক্বোরবানীর পশুর ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে থাকে, তাহলে এরকম পশুর স্থলে অন্য একটি পশু ক্বোরবানী করা যদিও ওয়াজিব নয়, তবে তা মুছ্তাহাব তথা উত্তম।

আর যদি ক্রেতা তথা ক্বোরবানী দাতার অবহেলা বা সুস্পষ্ট ভুলের কারণে এরূপ না হয়ে থাকে, বরং অন্য কোন দুর্ঘটনা বা কারণে কিংবা এমনিতে হয়ে থাকে, তাহলে ক্বোরবানী ওয়াজিব হোক বা মুছ্তাহাব, সর্বাবস্থায় এরূপ পশু দ্বারা ক্বোরবানী আদায় করা জায়িয রয়েছে। কেননা ক্রেতা পশুটি ক্রয় করার সময় নিখুঁত ও ক্রটিমুক্ত দেখেই কিনেছে, আর পরবর্তীতে যা হয়েছে তাতে ক্রেতার কোন হাত নেই, সুতরাং তজ্জন্য ক্রেতাকে দায়ী করা যাবে না এবং তার উপর এর কোন দায়ভার বর্তাবে না। কেননা শরী'য়তের বিধান হলো- আমানতদারের কোনরূপ হস্তক্ষেপ ব্যতীত যদি আমানত নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তজ্জন্য আমানতদারকে দায়ী করা যাবে না।

৩) ক্বোরবানীর জন্য পশু নির্ধারণ করতে হবে। আর এই নির্ধারণ দু'ভাবে করা যায়-

(ক) কথা দ্বারা। যেমন- কেউ যদি একটি পশু ক্রয় করার পর এরূপ বলে যে, "এটি হলো আমার ক্বোরবানীর পশু" আর এ কথা দ্বারা যদি তার উদ্দেশ্য হয় পশুটিকে ক্বোরবানীর জন্য নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট করা, তাহলে এরূপ কথা ও নিয়্যাতের দ্বারা পশুটি ক্বোরবানীর জন্য নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং তখন থেকে পশুটি ক্বোরবানীর পশু বলে গণ্য হয়। তবে যদি "এটি হলো ক্বোরবানীর পশু" বলে এটিকে ক্বোরবানীর জন্য নির্ধারণ বা সুনির্দিষ্ট করা উদ্দেশ্য না হয় বরং শুধুমাত্র এই মর্মে অবগত করা উদ্দেশ্য হয় যে, ভবিষ্যতে আমি পশুটি ক্বোরবানী দেয়ার ইচ্ছা রাখি, তাহলে এরূপ নিয়্যাত ও কথা দ্বারা পশুটি ক্বোরবানীর জন্য সুনির্দিষ্ট বা সুনির্ধারিত হবে না কিংবা ক্বোরবানীর পশু বলে গণ্য হবে না।

(খ) কাজের দ্বারা সুনির্ধারিতকরণ। এটি দু'ভাবে করা যেতে পারে-

(এক) ক্বোরবানীর নিয়্যাতে পশুটি যবেহ্ করা। যখন কেউ ক্বোরবানীর যোগ্য কোন পশুকে ক্বোরবানীর নির্ধারিত সময়ে ক্বোরবানীর নিয়্যাতে যবেহ্ করে নেবে, তখন যবেহ্কৃত পশুটি ক্বোরবানীর পশু বলে গণ্য হবে এবং তার উপর ক্বোরবানীর পশুর যাবতীয় বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।

(দুই) ক্বোরবানীর জন্য নির্ধারিত পশুর স্থলে ক্বোরবানী দেয়ার উদ্দেশ্যে অন্য একটি পশু ক্রয় করা। যেমন- ক্বোরবানীর জন্য একটি পশু নির্ধারণ করার পর পশুটি ক্বোরবানী দাতার অবহেলা বা ভুলের দরুন হারিয়ে যাওয়ার কিংবা ক্বোরবানীর অযোগ্য হয়ে পড়ার কারণে যদি তদস্থলে বা তার পরিবর্তে অন্য একটি পশু ক্রয় করা হয়, তাহলে হারিয়ে যাওয়া বা অযোগ্য হয়ে যাওয়া পূর্ববর্তী পশুটির স্থলবর্তী হিসেবে ক্রয়কৃত পশুটি ক্বোরবানীর পশু বলে গণ্য ও নির্ধারিত হয়ে যায়। কেননা পরিবর্তিত বিষয় বা বস্তুর উপর যে বিধান প্রযোজ্য ছিল, তার স্থলাভিষিক্ত বিষয় বা বস্তুর উপর সেই একই বিধান প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

যেহেতু হারিয়ে যাওয়া বা অযোগ্য হয়ে পড়া পশুটি ক্বোরবানীর পশু বলে নির্ধারিত ছিল এবং তার উপর ক্বোরবানীর পশুর বিধান প্রযোজ্য ছিল, অতএব তার স্থলাভিষিক্ত তথা তার পরিবর্তে ক্রয়কৃত পশুটি ক্বোরবানীর পশু বলেই গণ্য হবে এবং ঐ পশুটির ক্ষেত্রে যেসব বিধান প্রযোজ্য ছিল, তার স্থলাভিষিক্ত এই পশুটির ক্ষেত্রেও সেইসব বিধান প্রযোজ্য হবে।

তবে এছাড়া অর্থাৎ ক্বোরবানীর জন্য নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট পশুর স্থলে বা পরিবর্তে ক্রয়কৃত পশু ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে- **সাধারণভাবে ক্বোরবানীর নিয়্যাতে কোন পশু কেবল ক্রয় করলেই সেটি ক্বোরবানীর জন্য নির্ধারিত হবে না এবং সেটি ক্বোরবানীর পশু বলে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না নির্ধারণ করার উপরোল্লিখিত নিয়মাবলির যে কোন একটি নিয়ম অনুসরণ করা হবে।**

যেমন- একজন দাসকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে কেবল ক্রয় করলেই সেই দাস মুক্ত দাস বলে গণ্য হয় না এবং তার উপর মুক্ত দাসের বিধান প্রযোজ্য হয় না, যতক্ষণ না তাকে মুক্ত করা হয় কিংবা তার মুক্ত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত হয়।

এমনিভাবে কোন কিছু ওয়াক্ফ করার উদ্দেশ্যে কেবল ক্রয় করলেই তা ওয়াক্ফকৃত বলে গণ্য হয় না, যতক্ষণ না সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিতভাবে তা ওয়াক্ফ করা হয়। তদ্রূপ একটি পশু কেবল ক্বোরবানীর নিয়্যাতে ক্রয় করলেই সেটি ক্বোরবানীর পশু বলে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না সেটিকে সুবিধিত নিয়মে ক্বোরবানীর জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত করা হবে।

যখন একটি পশু ক্বোরবানীর জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে এবং ক্বোরবানীর পশু বলে গণ্য হয়ে যাবে তখন পশুটির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধানগুলো প্রযোজ্য হবে:-

১) পশুটিকে ক্বোরবানীর পরিপন্থি কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না। যেমন- এটিকে দান বা বিক্রি করা যাবে না কিংবা বন্ধক রাখা যাবে না। মোটকথা, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে পশুটির বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ কিংবা পশুটিকে ব্যবহার করা যাবে না।

যেমন- কেউ যদি ক্বোরবানীর জন্য একটি উট, গরু বা ছাগল নির্ধারণ করে নেয়ার পর- নির্ধারিত ঐ পশুটির প্রতি যে কোন কারণে তার মন আকৃষ্ট হয়ে যায়, তাই সে এই পশুটিকে ক্বোরবানী না দিয়ে এটিকে নিজের জন্য রেখে দিতে চায় এবং পরিবর্তে এর চেয়ে উত্তম অন্য একটি পশু ক্বোরবানী দিতে চায়, তাহলে এরূপ করা তার জন্য জায়িয নয়। কেননা এটা হলো আল্লাহ্র (ﷻ) জন্যে নির্ধারণকৃত বস্তুকে নিজের জন্য ফিরিয়ে নিয়ে আসা।

তবে হ্যাঁ, আদৌ নিজের ব্যক্তিগত কোন কারণে বা স্বার্থে নয় বরং নিছক ক্বোরবানীর স্বার্থে এবং একমাত্র আল্লাহ্র (ﷻ) সন্তুষ্টির নিমিত্ত যদি নির্ধারিত পশুটির পরিবর্তে এর থেকে উত্তম কোন পশু নেয়া হয়, তাহলে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

২) ক্বোরবানীর জন্য একটি পশু নির্ধারণ করার পর যদি নির্ধারণকারী মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য আবশ্যক হলো নির্ধারিত পশুটি ক্বোরবানী করা। আর যদি নির্ধারণ করার পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে উত্তরাধিকারীগণ পশুটিকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী ভোগ-ব্যবহার করতে পারবে।

৩) ক্বোরবানীর জন্য কোন পশু নির্ধারণ করার পর সেই পশু থেকে কোনরূপ ফায়দা নেয়া যাবে না এবং পশুটিকে একমাত্র ক্বোরবানী ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না। যেমন- পশুটি দ্বারা হাল-চাষ করা যাবে না, তার দুধ দোয়ানো যাবে না যদি তাতে তার কিংবা বাচ্চার কোন ক্ষতি হয়। তার লোম বা পশম কাটা যাবে না। তবে তাতে যদি পশুটির কোন উপকার হয় তাহলে তার লোম কাটা যাবে, তার দুধ দোয়ানো যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো বিক্রয়লব্ধ টাকা অবশ্যই সাদাক্বাহ্ বা হাদ্ইয়াহ্ হিসেবে দিয়ে দিতে হবে, তদ্বারা নিজে উপকৃত হওয়া যাবে না।

৪) ক্বোরবানীর জন্য পশু নির্ধারণ করার পর যদি সেটি মরে যায় বা চুরি হয়ে যায়, তাহলে এক্ষেত্রে দুই অবস্থা:-

(ক) যদি ক্বোরবানী দাতার অবহেলা-ভুল বা তার কোন কর্মকাণ্ডের কারণে মরে যায় কিংবা হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায়, তাহলে সমমানের-সমমূল্যের কিংবা এর থেকে উত্তম অন্য একটি পশু ক্বোরবানী করা ওয়াজিব। পরবর্তীতে হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হয়ে যাওয়া পশুটি যদি পাওয়া যায়, তাহলে এর মালিক হবেন ক্বোরবানীদাতা। তিনি এটিকে ভোগ-ব্যবহার, দান, বিক্রি, সাদাক্বাহ্ ইত্যাদি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারবেন।

(খ) যদি ক্বোরবানী দাতার অবহেলা বা ভুলের কারণে নয় কিংবা তার কোন ক্রিয়া-কর্মের দরুন নয় বরং অন্য কোন কারণে এরূপ কিছু ঘটে থাকে, তাহলে তাকে উক্ত পশুটির স্থলে অন্য আরেকটি পশু ক্বোরবানী করতে হবে না। কেননা পশুটি তার কাছে আমানত স্বরূপ ছিল। আর আমানত যদি এমনিতে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে যার কাছে বস্তুটি আমানত থাকে তার উপর কোন জামানত তথা ক্ষতিপূরণ বর্তায় না। তবে পরবর্তীতে যদি পশুটি কোনভাবে ফিরে পাওয়া যায়, তাহলে ক্বোরবানীর সময় চলে গেলেও পাওয়ার সাথে সাথে সেটি ক্বোরবানীর নিয়মে যবেহ্ করা দেয়া ওয়াজিব।

আর যদি ক্বোরবানীর জন্য পশু সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত করার আগেই কারো উপর ক্বোরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকে, যেমন কেউ যদি মানত করে থাকে যে "এ বছর আমি ক্বোরবানী করব" আর এমতাবস্থায় তার ক্রয়কৃত পশুটি যদি তার কারণে নয় বরং অন্য এমন কোন কারণে মরে যায় বা চুরি হয়ে যায় বা হারিয়ে যায়; যে কারণের পিছনে তার কোন হাত নেই বা তার কিছু করার সাধ্য নেই, তাহলে এমতাবস্থায়ও তার উপর ওয়াজিব হলো অন্য একটি পশু ক্বোরবানী করা। পরবর্তীতে যদি সে তার এই হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হয়ে যাওয়া পশুটি কোনভাবে ফিরে পায়, তাহলে সে পশুটির মালিক হবে এবং ইচ্ছানুযায়ী সে এটি ভোগ-ব্যবহার করতে পারবে। তবে এর স্থলে যে পশুটি ক্বোরবানী করেছিল সেটির মূল্য যদি পূর্বের হারিয়ে যাওয়া পশুটির মূল্য থেকে কম হয়ে থাকে, তাহলে যে পরিমাণ কম হবে সেই পরিমাণ মূল্য সাদাক্বাহ্ করে দিতে হবে।

সূত্র:- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল 'উছাইমীন সংকলিত "আহকামুল উযহিয়াহ্ ওয়ায যাকাত"।
শাইখ সালিহ ইবনু 'আব্দিল 'আযীয আ-ল আশ্‌শাইখ সংকলিত "আহকামুল হাদ্য়ি ওয়াল আযা-হী"।

বি: দ্র: যবেহ্ করার নিয়ম-পদ্ধতি সহ ক্বোরবানী সংক্রান্ত আরো বেশ কিছু জরুরী মাছায়িল ইনশা-আল্লাহ আগামী 'ইদুল আয্হা সংখ্যায় প্রকাশের আশা রাখি। এই সংখ্যাটি সযত্নে সংগ্রহে রাখুন।

দলীল-প্রমাণসহ আরো বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:
www.eshodinshikhi.com / www.learnislaminbangla.com

হাজ্জ ও 'উমরাহ্ পালনকারীর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বলেন- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- সৎ সঙ্গী এবং অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হলো (যথাক্রমে) 'আতর বহনকারী আর কামারের ন্যায়। তুমি যদি 'আতর বহনকারীর সঙ্গী হও, তাহলে হয়ত সে তোমাকে 'আতর দান করবে অথবা তুমি তার থেকে 'আতর কিনে নিবে কিংবা তুমি তার থেকে সুঘ্রাণ আর সুগন্ধি পাবে। পক্ষান্তরে তুমি যদি কামারের সঙ্গী হও, তাহলে হয়ত সে তোমার কাপড় (আগুনের ফুলকি দিয়ে) পুড়াবে নতুবা তুমি তার থেকে দুর্গন্ধ পাবে।

(সাহীহ্ বুখারী- ৫৫৩৪। সাহীহ্ মুছলিম- ৬৬৯২)

৪। হাজ্জ বা 'উমরাহ্ সম্পাদনের জন্য অবশ্যই সাথে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত অর্থ

রাখতে হবে, যাতে অর্থ-সম্পদের জন্য অন্যের দ্বারস্থ বা মুখাপেক্ষী না হতে হয়। আবূ ছা'ঈদ খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- যে ব্যক্তি মানুষের কাছে চাওয়া থেকে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ سبحانه وتعالى তাকে চাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, আর যে ব্যক্তি পরমুখাপেক্ষিতা থেকে দূরে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। (সাহীহ্ বুখারী- ১৪৬৯। সাহীহ্ মুছলিম- ২৪২৪)

৫। অবশ্যই হাজ্জ ও 'উমরাহ্ পালনকারীকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। মানুষের সাথে সুন্দর-সদাচারণ করতে হবে। তাকে হতে হবে মার্জিত চরিত্রের অধিকারী। আবূ যার্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- যেখানেই থাকো আল্লাহ্কে ভয় করো। মন্দ কাজ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে ভালো কাজ করে নাও, তাহলে এটা মন্দকে মুছে দিবে। আর (জেনে রেখো!) মানুষের সৃষ্টিকর্তা অতি উত্তম আদর্শবান। (জামে' তিরমিযী- ১৯৮৭)

'আব্দুল্লাহ্ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- যে ব্যক্তি দোযখ থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে ভালোবাসে, সে যেন আল্লাহ্ এবং শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং সে নিজে মানুষ থেকে যা কিছু পেতে পছন্দ করে, মানুষকেও যেন সে তা-ই প্রদান করে। (সাহীহ্ মুছলিম- ৪৭৭৬)

অর্থাৎ সে মানুষের কাছ থেকে নিজের জন্য যেরূপ ব্যবহার বা আচরণ প্রত্যাশা করে, মানুষের প্রতি তার আচরণও যেন হয় সেরূপ।

৬। হাজ্জ ও 'উমরাহ্‌কালীন আল্লাহ্‌র যিক্‌র, দু'আ এবং ইছ্‌তিগফারে মগ্ন থাকা উচিত। নিজের মুখকে শুধুমাত্র ভালো কথা-বার্তা ব্যতীত অযথা বা বাজে কথা-বার্তা থেকে হিফাযত করা আবশ্যক। ঐ সময়ের প্রতিটি মূহুর্তকে এমন কাজে লাগানো উচিত যদ্বারা ইহ-পরকালে উত্তম প্রতিফল লাভ করা যায়। আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- যে ব্যক্তি আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসে বিশ্বাস পোষণ করে, সে যেন উত্তম কথা বলে নতুবা নীরব থাকে। (সাহীহ্ বুখারী- ৬৪৭৫। সাহীহ্ মুছলিম- ৭৪)

ইবনু 'আব্বাছ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- এমন দু'টি নি'মাত রয়েছে যে দু'টোতে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ। আর তা হলো সুস্থতা এবং অবসর। (সাহীহ্ বুখারী- ৬৪১২)

৭। হাজ্জ ও 'উমরাহ্‌কালীন নিজের কোন কথা বা কাজ দ্বারা অন্যকে কষ্ট দেয়া থেকে অবশ্যই সতর্ক ও সাবধান থাকতে হবে। কেননা রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- মুছলমান সে-ই যার মুখ ও হাত থেকে মুছলমানগণ নিরাপদ।

(সাহীহ্ বুখারী- ১০। সাহীহ্ মুছলিম- ৬৪)

এমনিভাবে ধুমপানের দুর্গন্ধ দ্বারা অন্যকে কষ্ট দেয়া থেকেও সাবধান ও বিরত থাকতে হবে। কারো যদি ধুমপানের বদ-অভ্যাস থেকে থাকে, তাহলে তা পরিত্যাগ করা এবং তা থেকে আল্লাহ্‌র (عز وجل) কাছে তাওবাহ্ করা আবশ্যক। কেননা ধুমপান স্বাস্থের জন্য যেমন ক্ষতিকর, তেমনি তাতে অর্থেরও রয়েছে বিরাট অপচয়। উপরোক্ত উত্তম-চমৎকার গুণাবলী ও শিষ্টাচারগুলো সর্বাবস্থায় অনুসরণ ও অনুশীলনে সচেষ্ট থাকা প্রত্যক মুছলমানের উচিত। আর বিশেষ করে হাজ্জ ও 'উমরাহ সম্পাদনকালীন উপরোক্ত বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পালন করা অত্যাবশ্যক।

*** হাজ্ব ও 'উমরাহ্ পালনের জন্য অবশ্যই হালাল তথা শরী'য়ত সম্মত বৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদ ব্যয় করতে হবে। হারাম তথা অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ দ্বারা সম্পাদিত হাজ্জ ও 'উমরাহ্ আল্লাহ্‌র (عز وجل) নিকট আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ্ سبحانه وتعالى ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি হতে যা উৎপন্ন করেছি তা হতে উত্তম-পবিত্র বস্তু খরচ করো (ছূরা আল বাক্বারাহ- ২৬৭)

হাদীছে বর্ণিত রয়েছে, রাছূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- আল্লাহ হলেন পূতঃপবিত্র, তিনি পবিত্র ও উত্তম বস্তু ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করেন না। (সাহীহ্ মুছলিম)

ফযীলত

হাজ্জ ও 'উমরাহ্‌র ফযীলত বিষয়ে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনেক হাদীছ বর্ণিত রয়েছে, তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি হাদীছ পেশ করা হলো:-

১। রাছূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- এক 'উমরাহ্ আরেক 'উমরাহ্ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের যাবতীয় গুনাহের জন্য কাফ্‌ফারা। আর হাজ্জে মাবরূর (পূণ্যময় হাজ্জ) এর প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছু নয়। (সাহীহ্ বুখারী- ১৭৭৩। সাহীহ্ মুছলিম- ৩২৮৯)

২। উম্মুল মূ'মিনীন 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত, একদা তিনি রাছূলুল্লাহ্-কে (ﷺ) বললেন- হে আল্লাহ্‌র রাছূল! আমরা তো মনে করি যে, জিহাদ হলো সর্বোত্তম 'আমল, তাহলে আমরা কি জিহাদ করব না? রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন:- অর্থ- না, বরং তোমাদের জন্য উত্তম জিহাদ হলো হাজ্জে মাবরূর। (সাহীহ্ বুখারী- ১৫২০)

৩। আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:- আমি রাছূলুল্লাহ্-কে (ﷺ) বলতে শুনেছি:- অর্থ- যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হাজ্জ করল এবং অশালীন কথা-বার্তা ও পাপাচার থেকে বিরত রইল, সে ব্যক্তি ঐ দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসল যে দিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলেন। (সাহীহ্ বুখারী- ১৫২১। সাহীহ্ মুছলিম- ৩২৯১)

৪। রাছূলুল্লাহ্ ﷺ 'আম্‌র ইবনুল 'আস-কে (رضي الله عنه) বলেছিলেন:- অর্থ- হে 'আম্‌র! তুমি কি জানো যে, ইছলাম (ইছলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির) পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়, হিজরত তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ্ মুছে দেয়, আর হাজ্জ তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়? (সাহীহ্ মুছলিম- ৩২১)

হাজ্জ কার উপর ফার্‌য?

ইছলামের পাঁচটি ভিত্তির একটি হলো বাইতুল্লাহ্‌র হাজ্জ। হাজ্জ হলো ইছলামের একটি ফার্‌য বিধান যা ক্বোরআন, ছুন্নাহ ও ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত। প্রত্যেক মুছলমান, বিবেকবান, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন ও সক্ষম ব্যক্তির উপর হাজ্জ পালন করা ফার্‌য। তবে মহিলাদের উপর হাজ্জ ফার্‌য হওয়ার জন্য উপরোক্ত পাঁচটি শর্তের সাথে আরেকটি শর্ত রয়েছে। সেটি হলো হাজ্জের ছফরে গমনের জন্য ছফরসঙ্গী হিসেবে কোন মাহ্‌রাম থাকতে হবে। মহিলাদের জন্য এই ছয়টি শর্ত এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত পাঁচটি শর্ত একত্রে একসাথে যদি না পাওয়া যায় অর্থাৎ পূর্ণ না হয়, তাহলে হাজ্জ বা 'উমরাহ্ পালন ফার্‌য হবে না। আর যার মধ্যে এই শর্তগুলো একত্রে একসাথে পাওয়া যাবে, তার উপর জীবনে একবার হাজ্জব্রত পালন করা ফার্‌য।

হাদীছে বর্ণিত রয়েছে, নাবী ﷺ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন:- অর্থ- হে মানবসম্প্রদায়! আল্লাহ হাজ্জ ফার্‌য করেছেন, সুতরাং তোমরা হাজ্জ করবে। একথা শুনে একজন লোক জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাছূল! এটা কি প্রতি বছর? রাছূলুল্লাহ্ ﷺ নীরব থাকেন (তার প্রশ্নের কোন উত্তর দেননি)। ঐ ব্যক্তি তিন বার নাবী-কে (ﷺ) সেই একই বিষয় জিজ্ঞেস করেন। তখন রাছূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তাহলে প্রতি বছরই হাজ্জ সম্পাদন করা ফার্‌য হয়ে যেত। অতঃপর তোমরা তা পালন করতে পারতে না। এরপর নাবী ﷺ বলেন, আমি যা বলব না, তোমরা সে সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা অধিক প্রশ্ন করার ফলে এবং নাবীগণের ('আলাইহিমুছ্ ছালাম) সাথে ভিন্নমত সৃষ্টি করার কারণে ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং তোমরা আমার নির্দেশ সাধ্যানুসারে পালন করো এবং যে বিষয় হতে আমি নিষেধ করি তা হতে বিরত থাকো।

(মুছনাদে ইমাম আহমাদ- ২/৫০৮। সাহীহ্ মুছলিম- ২/৯৭৫)

হাজ্জ ফার্‌য হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হলো সক্ষমতা। এই সক্ষমতার অর্থ হলো শারীরিক এবং আর্থিক দু'ভাবেই সক্ষমতা। কেননা আল্লাহ سبحانه وتعالى ইরশাদ করেছেন:- অর্থ- এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এই গৃহের হাজ্ব করা সেই সব মানুষের কর্তব্য, যারা সেই পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে। (ছূরা আ-লে 'ইমরান- ৯৭)

সুতরাং কেউ যদি বয়োঃবৃদ্ধতা বা এমন কোন অসুস্থতা যা থেকে সাধারণত সুস্থ হওয়ার আশা করা যায় না কিংবা কেউ যদি শারীরিকভাবে সুস্থ থাকে কিন্তু তার কাছে হাজ্জ ও 'উমরাহ্ সম্পাদন করার মতো পর্যাপ্ত অর্থ-সম্পদ না থাকে, তাহলে তার উপর হাজ্জ পালন করা ফার্‌য নয়। তবে কেউ যদি শারীরিকভাবে অক্ষম হয় কিন্তু তার কাছে হাজ্জ ও 'উমরাহ্ পালন করার মতো প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত অর্থ-সম্পদ থাকে, তাহলে তার কর্তব্য হলো নিজের স্থলাভিষিক্ত কাউকে দিয়ে হাজ্জ ও 'উমরাহ্ সম্পাদন করা। অর্থাৎ নিজের পক্ষ হতে অন্য কাউকে দিয়ে তা আদায় করিয়ে নেয়া। এর প্রমাণ হলো আবূ রাযীন আল 'উক্বাইলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত যে, তিনি এসে রাছূলুল্লাহ-কে (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন:- অর্থ- হে আল্লাহ্‌র রাছূল! আমার বাবা একজন বয়োঃবৃদ্ধ লোক। হাজ্জ, 'উমরাহ্ বা ছফর করার ক্ষমতা তার নেই। রাছূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন- তুমি তোমার বাবার পক্ষ হতে হাজ্জ ও 'উমরাহ্ সম্পাদন করে নাও। (তিরমিযী- ৯৩০)

ফায্‌ল ইবনু 'আব্বাছ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:- অর্থ- বিদায় হাজ্জের বছর খাছ'আম গোত্রের একজন মহিলা এসে রাছূলুল্লাহ্-কে (ﷺ) বললেন- হে আল্লাহ্‌র রাছূল! বান্দাহ্‌র উপর আল্লাহ্‌র ফার্‌যকৃত বিধান হাজ্জ আমার পিতাকে এমন সময় পেয়ে বসেছে (অর্থাৎ আমার পিতার উপর এমন সময় ফার্‌য হয়েছে) যখন তিনি বাহনের উপর ঠিকভাবে বসে থাকতে সক্ষম নন। এমতাবস্থায় আমি যদি তার পক্ষ হতে হাজ্জ আদায় করি, তাহলে তার হাজ্জ আদায় হবে কি? তিনি (রাছূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন, হ্যাঁ (আদায় হবে)। {সাহীহ্ বুখারী- ১৮৫৪। সাহীহ্ মুছলিম-৩২৫২}

যদি কোন লোক পর্যাপ্ত অর্থ-সম্পদ রেখে হাজ্জ আদায় না করে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে হাজ্জের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পৃথক করে রাখতে হবে এবং তদ্বারা অন্য কাউকে দিয়ে তার পক্ষ হতে হাজ্জ আদায় করতে হবে। এর প্রমাণ হলো- বারীদাহ্ ইবনুল হুসাইব رضي الله عنه হতে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে যে, একজন মহিলা যার মা হাজ্জ আদায় না করে মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি এসে রাছূলুল্লাহ্-কে (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন যে, "তিনি (প্রশ্নকারী মহিলার মা) কখনো হাজ্জ করেননি, তাহলে আমি কি তার পক্ষ হতে হাজ্জ আদায় করব"? রাছূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন:- অর্থ- তুমি তার পক্ষ হতে হাজ্জ আদায় করে নাও। (সাহীহ্ মুছলিম- ২৬৯৭)

শারীরিক এবং অর্থ-সম্পদের দিক দিয়ে সক্ষম ও সামর্থবান হলেও একজন মহিলা ততক্ষণ পর্যন্ত হাজ্জ করতে সক্ষম বিবেচিত হবেন না, যতক্ষণ না তার সাথে হাজ্জে গমনের জন্য একজন মাহ্‌রাম পাওয়া যাবে। এ সম্পর্কে ইবনু 'আব্বাছ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- "মেয়েরা মাহ্‌রাম ব্যতীত অন্য কারো সাথে ছফর করবে না, মাহ্‌রাম সাথে নেই এমন অবস্থায় কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার কাছে না যায়"। এ সময় এক ব্যক্তি বললেন: হে আল্লাহ্‌র রাছূল!

আমি অমুক অমুক সেনাদলের সাথে (জিহাদের জন্য) বের হতে চাচ্ছি, ওদিকে আমার স্ত্রী হাজ্জে যেতে চাইছে। রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন:- তুমি তার (তোমার স্ত্রীর) সাথে যাও। (সাহীহ্ বুখারী- ১৮৬২। সাহীহ্ মুছলিম- ৩২৭২)

উক্ত হাদীছে দেখা যায় যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ প্রশ্নকারীকে জিহাদ বাদ দিয়ে স্ত্রীর সাথে হাজ্জে গমনের নির্দেশ দিয়েছেন। যদি মাহ্‌রাম ব্যতীত হাজ্জে গমন করা গুনাহের কাজ না হতো, তাহলে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ প্রশ্নকারী উক্ত ব্যক্তিকে জিহাদ বাদ দিয়ে স্ত্রীর সাথে হাজ্জে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করতেন না। কেননা জিহাদও ইছলামের একটি অবশ্য কর্তব্য-কর্ম।

উল্লেখ করা আবশ্যক যে, যদি কোন মহিলা মাহ্‌রাম ব্যতীত হাজ্জে গমন করে হাজ্জ সম্পাদন করে নেয়, তাহলে তার হাজ্জ আদায় হয়ে যাবে। তবে মাহরাম ছাড়া ছফর করার জন্য অবশ্যই সে গুনাহ্‌গার হবে।

পবিত্র মাক্কাহ নগরীতে অবস্থানকারী মহিলার হাজ্জ সম্পাদনের জন্য মাহ্‌রাম সাথে থাকা আবশ্যক নয়। তিনি মাহ্‌রাম ছাড়া অন্যান্য বিশ্বস্থ মহিলাদের সাথে হাজ্জ আদায় করতে পারবেন। কেননা মাক্কাহ্ নগরীতে অবস্থানকারীকে হাজ্জ সম্পাদনের জন্য ছফর করতে হয় না। তাই এক্ষেত্রে মাহ্‌রাম সাথে থাকা শর্ত নয়।

মাহ্‌রাম কারা?

একজন মহিলার জন্য মাহরাম হলো- প্রথমত: তার স্বামী। দ্বিতীয়ত: বংশ সম্পর্কীয় কারণে যাদেরকে সর্বাবস্থায় আজীবন বিয়ে করা হারাম তথা নিষিদ্ধ। তৃতীয়ত: দুগ্ধদান কিংবা দুগ্ধপানের কারণে যাদেরকে বিয়ে করা আজীবন হারাম। চতুর্থত: বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যাদেরকে বিয়ে করা আজীবন হারাম।

বংশ সম্পর্কের দরুন মাহ্‌রাম তথা যাদেরকে বিয়ে করা আজীবন হারাম তারা হলেন:- (১) মহিলার পিতা (২) ছেলে (৩) ভাই (৪) চাচা (৫) মামা।

দুগ্ধদান বা দুগ্ধপানের দরুন যাদেরকে বিয়ে করা আজীবন হারাম তারা হলেন- (১) দুগ্ধপিতা (২) দুগ্ধপুষ্য ছেলে (৩) দুগ্ধভাই (৪) দুগ্ধচাচা (৫) দুগ্ধমামা।

বৈবাহিক সম্পর্কের দরুন যাদেরকে বিয়ে করা আজীবন হারাম তারা হলেন- (১) বিবাহিত মহিলার শশুর (২) স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভের ছেলে (৩) মহিলার মায়ের স্বামী; যিনি তার পিতা নহেন। (৪) মহিলার মেয়ের স্বামী তথা জামাই। এরা সকলেই মহিলার মাহ্‌রাম বলে গণ্য হবেন।

লি'আনের দ্বারা স্থায়ীভাবে ও আজীবনের জন্য যদিও একজন পুরুষ একজন মহিলার জন্য হারাম হয়ে যায়, তবে এর দ্বারা ঐ লোক মহিলার মাহ্‌রাম বলে গণ্য হয় না।

এমনিভাবে যাদের সাথে সাময়িকভাবে বিয়ে হারাম, যেমন-একজন স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর বোন, স্ত্রীর ফুফু, স্ত্রীর খালা, স্ত্রীর ভাই-ঝী, স্ত্রীর বোন-ঝী এদেরকে সাময়িকভাবে অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত স্ত্রী বিদ্যমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত বিয়ে করা যদিও হারাম, কিন্তু এসব মহিলা ঐ পুরুষের জন্য স্থায়ীভাবে তথা আজীবন হারাম না হওয়ার কারণে (কেননা স্ত্রী মারা গেলে কিংবা স্ত্রীকে তালাক্ব দিয়ে দিলে এসব মহিলার মধ্য হতে যে কাউকে বিয়ে করা ঐ পুরুষের জন্য বৈধ হয়ে যায়) সে তাদের জন্য (এসব মহিলার জন্য) মাহ্‌রাম বলে গণ্য হবে না এবং তাকে নিয়ে তাদের কারো ছফর করাও জায়িয হবে না।

হাজ্জ ও 'উমরাহ্‌র রুক্‌ন বা ভিত্তিসমূহ

রুক্‌ন বা ভিত্তি বলতে এমন বিষয়কে বুঝায় যে বিষয়টি পালন বা বাস্তবায়ন ছাড়া তার মূল বিষয়টি অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না এবং যার কোন বিকল্পও নেই। যদ্দরুণ সে বিষয়টি পালন বা বাস্তবায়ন করা অবশ্য কর্তব্য।

হাজ্জ ও 'উমরাহ্‌র রুক্‌ন-আরকান বলতে ঐ সব কাজ-কর্মকে বুঝায়, যেসব কাজ-কর্ম পালন ও বাস্তবায়ন ব্যতীত হাজ্জ বা 'উমরাহ্ আদৌ সম্পন্ন হয় না এবং এসবের কোন একটিও বাদ পড়লে হাজ্জ বা 'উমরাহ্ বাতিল হয়ে যায়।

'উমরাহ্‌র রুক্‌ন তিনটি- (১) ইহ্‌রাম (২) ত্বাওয়াফ অর্থাৎ ত্বাওয়াফে ক্বোদূম (৩) ছা'য়ী।

হাজ্জের রুক্‌ন ৪টি। (১) ইহ্‌রাম (২) 'আরাফাহ্‌র মাঠে অবস্থান (৩) ত্বাওয়াফ অর্থাৎ ত্বাওয়াফে ইফাযাহ্ (৪) ছা'য়ী।

হাজ্জ বা 'উমরাহ্‌র কার্যক্রম শুরুর নিয়্যাত বা দৃঢ় সংকল্পকে ইহ্‌রাম বলা হয়।

ইহ্‌রাম হলো হাজ্জ ও উমরাহ্‌র অন্যতম একটি রুক্‌ন। এর প্রমাণ হলো- 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- কাজ (কাজের প্রতিদান) নির্ভর করে নিয়্যাতের উপর। প্রত্যেক লোক তা-ই পাবে, যা সে নিয়্যাত করবে। (সাহীহ্ বুখারী- ১। সাহীহ্ মুছলিম- ৪৯২৭)

ত্বাওয়াফে ইফাযাহ্ হলো হাজ্জের আরেকটি রুক্‌ন। আর ত্বাওয়াফে ক্বোদূম হলো 'উমরাহ্‌র রুক্‌ন। হাজ্জ পালনকারীকে অবশ্যই ত্বাওয়াফে ইফাযাহ্ করতে হবে। আর 'উমরাহ্ পালনকারীকে ত্বাওয়াফে ইফাযাহ্ নয় বরং ত্বাওয়াফে ক্বোদূম অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে। এর প্রমাণ হলো- ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থ- এবং অবশ্যই তারা যেন সম্মানিত গৃহের ত্বাওয়াফ করে। (ছূরা আল হাজ্জ- ২৯)

অধিকাংশ 'উলামায়ে কেরামের মতে সাফা এবং মারওয়ার মধ্যখানে সাতবার চক্কর দেয়া হাজ্জ ও 'উমরাহ্‌র আরেকটি রুক্‌ন। তামাত্তু' হাজ্জ পালনকারীকে ত্বাওয়াফে ইফাযাহ্‌র পরে এবং ইফরাদ বা ক্বিরান হাজ্জ পালনকারীকে ত্বাওয়াফে ক্বোদূম কিংবা ত্বাওয়াফে ইফাযাহ্‌র পরে এবং 'উমরাহ্ পালনকারীকে ত্বাওয়াফে ক্বোদূমের পরে অবশ্যই সাফা ও মারওয়ার মাঝে ৭ বার ছা'য়ী করতে হবে। এর প্রমাণ হলো- ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থ- নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া হলো আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের মধ্য হতে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই গৃহের হাজ্জ বা 'উমরাহ্ করবে তার জন্য এই দু'য়ের ত্বাওয়াফ করতে কোন অসুবিধা নেই। (ছূরা আল বাক্বারাহ্- ১৫৮)

এই আয়াতের ব্যখ্যায় তাফছীরে ত্বাবারীতে 'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেছেন:- অর্থ- যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার মধ্যে ছা'য়ী করল না, সে হাজ্জই করল না। (বর্ণনাটি সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুছলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণিত)

সাফা ও মারওয়ার মধ্যে ছা'য়ী সম্পর্কে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- হে মানবজাতি (হাজ্জ ও 'উমরাহ্ পালনকারী জনতা)! তোমরা ছা'য়ী করো (সাফা ও মারওয়ার মাঝে ছা'য়ী করো), কেননা ছা'য়ী তোমাদের জন্য ফারয করে দেয়া হয়েছে। (দারু ক্বোত্বনী- ২/২৫৫) এই হাদীছটি আরো বিভিন্ন ছনদে বর্ণিত রয়েছে।

হাজ্জের আরেকটি রুক্‌ন হলো 'আরাফাহ্‌র মাঠে অবস্থান। এর প্রমাণ হলো- আল্লাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থাৎ- যখন তোমরা 'আরাফাহ্ থেকে প্রত্যাবর্তিত হও। (ছূরা আল বাক্বারাহ্- ১৯৮)

'আরাফাহ্ থেকে প্রত্যাবর্তন কেবল তখনই করা সম্ভব হবে যখন এর আগে 'আরাফাহ্-তে অবস্থান গ্রহণ করা হবে। সুতরাং এই আয়াত দ্বারা 'আরাফাহ্-তে অবস্থান গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এই নির্দেশ দ্বারা বিষয়টির অত্যাবশ্যকতা প্রমাণিত হয়।

এছাড়া 'আব্দুর রাহ্‌মান ইবনু 'আউফ رضي الله عنه হতে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, তিনি বলেছেন:- অর্থ- আমি রাছূলুল্লাহ্-কে (ﷺ) দেখেছি- তিনি 'আরফাহ্-তে অবস্থানরত ছিলেন, এমতাবস্থায় নাজ্‌দের অধিবাসী কিছু লোক তাঁর নিকট এসে বললেন- হে আল্লাহ্‌র রাছূল! হাজ্জ কিভাবে (কিভাবে আদায় করতে হয় কিংবা হাজ্জের মূল কাজটি কি)? রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন: "হাজ্জ হলো 'আরাফাহ" (অর্থাৎ 'আরাফাহ্‌তে অবস্থানই হলো হাজ্জের মূল কাজ)।

{ছুনানু ইবনে মাজাহ্- ৩০১৫। অন্যান্য ছুনান গ্রন্থেও এই হাদীছটি বর্ণিত রয়েছে}

হাজ্জ এবং 'উমরাহ্-র ওয়াজিব সমূহ

'উমরাহ্ বা হাজ্জের ওয়াজিব সমূহ বলতে ঐ সকল কাজ-কর্মকে বুঝায়, যেগুলো পালন করা অত্যাবশ্যক এবং যেসব কাজের কোন একটিও যদি বাদ পড়ে যায়, তাহলে তাতে হাজ্জ বা 'উমরাহ্ বাতিল হবে না বটে, তবে এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে অবশ্যই দম তথা পশু ক্বোরবানী দিতে হবে। আর এই পশুর গোশ্‌ত থেকে নিজে কিছু খেতে পারবে না বরং সবটুকু হরমের (পবিত্র মাক্কাহ্ নগরীতে অবস্থানরত) ফকীর-মিছকীনদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। এর প্রমাণ হলো- ইবনু 'আব্বাছ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:- অর্থ- কেউ যদি তার হাজ্জে কোন কার্যক্রম ভুলে যায়, তবে সে যেন অবশ্যই রক্ত প্রবাহিত করে। (মুআত্তা ইমাম মালিক- ১/৪১৯)

'উমরাহ্‌র ওয়াজিব হলো দু'টি:- ১) মীক্বাত থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা। ২) হালাল হওয়ার সময় মাথা মুন্ডানো বা চুল কেটে ছোট করা।

হাজ্জের ওয়াজিব কর্ম হচ্ছে সাতটি:- ১) মীক্বাত থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা। ২) হালাল হওয়ার সময় মাথা মুন্ডানো বা চুল ছোট করা। ৩) দিনের বেলা এসে যিনি 'আরাফাহ্-তে অবস্থান করবেন তার জন্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত 'আরাফাহ্‌র মাঠে অবস্থান করা। ৪) মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করা। ৫) ইয়াওমুন্ নাহ্‌র অর্থাৎ ক্বোরবানীর দিন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়ার আগে বা পরে জামরায়ে 'আক্বাবাহ্-তে পাথর নিক্ষেপ আর তাশরীক্বের ২/৩ দিন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়ার পরে তিনটি জামরাহ্-তে পাথর নিক্ষেপ। ৬) তাশরীক্বের দিনগুলোতে মীনায় রাত্রি যাপন। ৭) বিদায়ী ত্বাওয়াফ।

এসব বিষয় যে ওয়াজিব, নিম্নে ধারাবাহিকভাবে এর প্রমাণ পেশ করা হলো:-

মীক্বাত থেকে ইহ্‌রাম ওয়াজিব। এর প্রমাণ হলো- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ হাজ্জের মীক্বাত (ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য নির্ধারিত স্থান) সমূহ সম্পর্কে জানিয়ে দেয়ার পর বলেছেন:- অর্থ- এইসব মীক্বাত হচ্ছে ঐসব এলাকাবাসীর জন্যে, অনুরূপ তাদের জন্যও যারা ভিন্ন এলাকা থেকে হাজ্জ বা 'উমরাহ্ পালনের উদ্দেশ্যে এইসব মীক্বাত দিয়ে অতিক্রম করবে। আর যারা এসব মীক্বাতের অভ্যন্তরীণ এলাকায় বসবাসকারী হবে, তারা তাদের নিজ নিজ এলাকার যেখান থেকে হাজ্জ বা 'উমরাহ্‌র উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে, সে স্থানটিই তাদের জন্যে মীক্বাত বলে গণ্য হবে। এমনকি মাক্কাহ্‌র অধিবাসীরা মাক্কাহ্ থেকেই ইহ্‌রাম বাঁধবে। (সাহীহ্ বুখারী- ১৫২৪। সাহীহ্ মুছলিম- ২৬৯৩)

মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাঁটা ওয়াজিব। এর প্রমাণ হলো- আল্লাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থ- নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর রাছূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মাছজিদুল হারামে প্রবেশ করবে- নিরাপদে, মস্তক মুন্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। (ছূরা আল ফাত্‌হ্- ২৭)

এ সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত রয়েছে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- হে আল্লাহ্! মাথা মুন্ডনকারীদের ক্ষমা করুন। তারা (সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم) বললেন- যারা চুল ছোট

করেছে তাদেরকেও। রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন- হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের আপনি ক্ষমা করুন। তারা বললেন- যারা চুল ছোট করেছে তাদেরকেও। রাছূলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি (হে আল্লাহ্! মাথা মুন্ডনকারীদের ক্ষমা করুন) তিনবার বললেন। এরপর বললেন- যারা চুল ছোট করেছে তাদেরকেও (ক্ষমা করুন)।

{সাহীহ্ বুখারী- ১৭২৭। সাহীহ্ মুছলিম- ৩১৪৮}

দিনের বেলা অবস্থানকারীর জন্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত 'আরাফাহ্র মাঠে অবস্থান করা ওয়াজিব। (সাধারণভাবে কেবল অবস্থান করা হলো রুক্ন)। এর প্রমাণ হলো- জাবির ﷺ হতে রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এর হাজ্জের বিবরণ সম্বলিত হাদীছে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেছেন- অর্থ- সূর্য অস্তমিত হয়ে (সূর্য অদৃশ্য হয়ে) হলদে ভাব কিছুটা চলে যাওয়া পর্যন্ত রাছূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে ('আরাফাহ্র ময়দানে) অবস্থানরত ছিলেন। (সাহীহ্ মুছলিম- ২৯৫০)

অন্য হাদীছে বর্ণিত রয়েছে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:- অর্থ- তোমরা অবশ্যই হাজ্জের নিয়ম-নীতিগুলো আমার থেকে গ্রহণ (শিক্ষা) করো। (সাহীহ্ মুছলিম- ৩১৩৭)

সুতরাং যেহেতু রাছূলুল্লাহ ﷺ সূর্যাস্ত পর্যন্ত 'আরাফাহ্র ময়দানে অবস্থান করেছিলেন, তাই হাজ্জব্রত পালনের সময় 'আরাফাহ্র ময়দানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা আমাদের জন্যও আবশ্যক।

মুযদালিফায় রাত্রি যাপন। এর প্রমাণ হলো আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থ- অতঃপর যখন তোমরা 'আরাফাহ্ হতে প্রত্যাবর্তিত হও, তখন মাশ'আরে হারামের নিকট আল্লাহ্কে স্মরণ করো। (ছূরা আল বাক্বারাহ্- ১৯৮)

আয়াতে উল্লেখিত "মাশ'আরুল হারাম" বলতে মুযদালিফাহ্কে বুঝানো হয়েছে। রাছূলুল্লাহ্ ﷺ এখানে রাত্রি যাপন করেছেন। ভোর পর্যন্ত তিনি এখানে অবস্থান করেছেন। তবে তিনি দুর্বল মহিলা ও শিশুদেরকে রাতের শেষ প্রহরে মুযদালিফাহ্ থেকে মীনার উদ্দেশ্যে চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। দুর্বলদের ক্ষেত্রে তাঁর এই অনুমতি প্রমাণ করে যে, সবল-সক্ষমদের জন্য সমগ্র রাত্রব্যাপী মুযদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব।

ক্বোরবানীর দিন জামরায়ে 'আক্বাবাহ্তে সূর্য ঢলে পড়ার আগে বা পরে পাথর নিক্ষেপ করা এবং তাশরীক্বের দিনগুলোতে সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে তিনটি জামরাহ্-তে পাথর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। এর প্রমাণ হলো- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ ক্বোরবানীর দিন চাশ্তের সময় জামরাহ্-তে পাথর নিক্ষেপ করেছেন। আর ক্বোরবানীর দিনের পরে অর্থাৎ ১০ই যিলহাজ্জের পরের দিনগুলোতে (আইয়্যামে তাশরীক্বের দিনগুলোতে) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর পাথর নিক্ষেপ করেছেন।

(সাহীহ্ মুছলিম- ৩১৪১)

তাছাড়া ছুনানু নাছায়ীতে 'আসিম ইবনু 'আদী ﷺ হতে সাহীহ্ ছনদে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে যে, রাছূলুল্লাহ্ ﷺ রাখালদের জন্য মীনায় রাত্রিযাপন না করার এবং ইয়াওমুন্ নাহ্র এবং তার পরবর্তী তিন দিনের পরিবর্তে দুই দিন পাথর নিক্ষেপের অনুমতি দিয়েছেন।(ছুনানে নাছায়ী- ৩০৬৯)। কিন্তু কোন অবস্থাতেই পাথর নিক্ষেপের কাজ থেকে তিনি তাদেরকে অব্যাহতি দেননি। সুতরাং তা প্রমাণ করে যে, জাম্রাহ্গুলোতে পাথর নিক্ষেপ হাজ্জের একটি আবশ্যকীয় কাজ।

আইয়্যামে তাশরীক্বের তিন দিন (১১-১৩ই যিলহজ্জ) অথবা যারা তাড়াহুড়ো করতে চান তাদের জন্য দুই দিন (১১ ও ১২ই যিলহাজ্জ) মীনায় রাত্রিযাপন করা ওয়াজিব। এর প্রমাণ হলো- আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থ- আর তোমরা নির্ধারিত দিনসমূহে আল্লাহ্কে স্মরণ করো, অতঃপর কেহ যদি দু'দিনের মধ্যে (অর্থাৎ দু'দিন মীনায় অবস্থান করে মাক্কায় ফিরে যাওয়ার জন্য) তাড়াহুড়া করে, তাহলে তার জন্য কোন পাপ নেই। পক্ষান্তরে যে বিলম্ব করল তারও কোন পাপ নেই। আর এই বিলম্ব করাটা খোদাভীরুদের জন্যই মানানসই। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং জেনে রেখো যে, নিশ্চয়ই তোমাদের সকলকে তাঁরই কাছে সমবেত করা হবে। (ছূরা আল বাক্বারাহ্- ২০৩)

রাছূলুল্লাহ্ ﷺ আইয়্যামে তাশরীক্বের তিন রাত মীনায় যাপন করেন এবং ১৩ই যিলহাজ্জ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর জামরাহ্গুলোতে পাথর নিক্ষেপ সম্পন্ন করে তিনি মীনা থেকে প্রস্থান করেন। তাছাড়া রাখাল এবং মাক্কায় হাজীগণকে পানি পান করানোর দায়িত্বে যারা নিয়োজিত, তাদেরকে মীনায় রাত্রিযাপন না করার অনুমতি দিয়েছেন। তাদেরকে অনুমতি দেয়া এটাই প্রমাণ করে যে- যারা পশুচারণ, পানি পান করানো কিংবা হাজ্জীগণের প্রয়োজনে বিশেষ কোন দায়িত্বে নিয়োজিত নয়, তাদের জন্য তাশরীক্বের দিনগুলোতে মীনায় রাত্রিযাপন করা ওয়াজিব।

বিদায়ী ত্বাওয়াফ করা ওয়াজিব। এর প্রমাণ হলো- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ মাক্কাহ্ হতে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বিদায়ী ত্বাওয়াফ করেছেন।

ইবনু 'আব্বাছ ﷺ হতে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে যে, মানুষকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে- তাদের সর্বশেষ কাজ যেন হয় বাইতুল্লাহ্ কেন্দ্রিক (বাইতুল্লাহ্র ত্বাওয়াফ)। তবে ঋতুবতীদের জন্য এ হুক্মটি শিথিল করে দেয়া হয়েছে; তাদের জন্য এ নির্দেশটি আবশ্যকীয় নয়। (সাহীহ্ বুখারী- ১৭৫৫। সাহীহ্ মুছলিম- ৩২২০)

ঋতুবতী মহিলাদের জন্য বিদায়ী ত্বাওয়াফ না করার অনুমতি প্রদান- এ কথাই প্রমাণ করে যে, অন্যান্যদের জন্য বিদায়ী ত্বাওয়াফ একটি আবশ্যকীয় কাজ।

মীক্বাত সমূহ

মীক্বাত (হাজ্জ বা 'উমরাহ্র জন্য ইহ্রাম বাঁধার নির্ধারিত স্থান) হলো মোট পাঁচটি:- ১) যুলহুলাইফাহ্। ২) জুহ্ফাহ্। ৩) ক্বারনুল মানাযিল। ৪) ইয়ালামলাম। ৫) যা-তু 'ইর্ক্ব।

ইবনু 'আব্বাছ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:- অর্থ- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনাবাসীদের জন্য যুলহুলাইফাহ্-কে, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহ্ফাহ্-কে, নাজ্দবাসীদের (তথা পূর্বাঞ্চলবাসী ও পূর্বদিক হতে আগমনকারীদের) জন্য ক্বারনুল মানাযিল-কে, ইয়ামনবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম-কে মীক্বাত নির্ধারণ করেছেন। এগুলো হলো ঐসব এলাকার অধিবাসীদের জন্য এবং তাদের জন্য যারা হাজ্জ ও 'উমরাহ্ পালনের উদ্দেশ্যে এসব স্থান দিয়ে অতিক্রম করবে। আর যারা এসব মীক্বাতের ভিতরের এলাকায় অবস্থান করবে, তারা যেখান থেকে যাত্রা শুরু করবে, তাদের এলাকার সে স্থানই তাদের জন্য মীক্বাত বলে গণ্য হবে। এমনকি মাক্কাবাসীরা মাক্কা থেকেই ইহ্রাম বাঁধবে।

(সাহীহ্ বুখারী- ১৫২৪। সাহীহ্ মুছলিম- ২৬৯৩)

{উল্লেখ্য যে, এই হাদীছের আলোকেই জুহ্ফাহ্-কে মিসরের অধিবাসীদের মীক্বাত এবং ইয়ালামলাম-কে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মীক্বাত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।}

ছুনানে নাছায়ী এবং ছুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা পঞ্চম মীক্বাতটির কথা প্রমাণিত রয়েছে। আর তা হলো- 'ইরাক্ববাসীদের জন্য "যাতু 'ইর্ক্ব"। এ সম্পর্কে আবূ দাউদে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে, 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা বলেছেন:- অর্থ- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ 'ইরাক্ববাসীদের জন্য যাতু 'ইর্ক্ব নামক স্থানকে মীক্বাত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মাক্কাবাসীরা হাজ্জের ইহ্রাম স্ব স্ব বাসস্থান থেকে বাঁধতে পারবেন। তবে 'উমরাহ্র ইহ্রাম হরমের বাহিরে থেকে বাঁধতে হবে। এর প্রমাণ হলো- রাছূলুল্লাহ্ ﷺ 'আয়িশাহ্-কে (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) হরমের বাহিরে গিয়ে তান'য়ীম নামক স্থান থেকে 'উমরাহ্র ইহ্রাম বেঁধে আসার নির্দেশ দিয়েছেন। (সাহীহ্ বুখারী- ১৭৬২। সাহীহ্ মুছলিম- ২৮০১)

যাই হোক, **যদি কেউ হাজ্জ বা 'উমরাহ্র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে সরাসরি এসব মীক্বাত দিয়ে অতিক্রম না করে, তাহলে জলপথে, স্থলপথে কিংবা আকাশ পথে যে পথেই হোক- সে যখন মীক্বাতের বরাবর বা সমান্তরালে চলে আসবে, তখন সাথে সাথে তাকে ইহ্রাম বেঁধে নিতে হবে। যদি কেউ মীক্বাতে পৌঁছার আগেই ইহ্রাম বেঁধে নেয় তাহলেও তার ইহ্রাম বাধা সঠিক হবে। তবে মীক্বাতে গিয়ে ইহ্রাম বাঁধা সবচেয়ে উত্তম। কিন্তু এক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, কোনভাবেই ইহ্রাম না বাঁধা অবস্থায় মীক্বাত অতিক্রম করা যেন না হয়। যদি কেউ ইহ্রাম না বেঁধে কিংবা ইহ্রাম বাঁধার আগেই মীক্বাত অতিক্রম করে ফেলে তাহলে তাকে পুনরায় মীক্বাতে গিয়ে ইহ্রাম বেঁধে আসতে হবে, অন্যথায় তার হাজ্জ আদায় হবে না।**

হাজ্জ ও 'উমরাহ্ পালনের সময়-সীমা

'উমরাহ্ পালনের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন সময়-সীমা নেই। বছরের যে কোন সময় 'উমরাহ্ পালন করা যায়। কেননা ক্বোরআন বা ছুন্নাহ্র কোথাও 'উমরাহ্ পালনের জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট বা নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। তবে হাজ্জ বছরের যে কোন সময় পালন করা যাবে না বরং এর জন্য নির্ধারিত সময় তথা মাস রয়েছে। হাজ্জের মাসগুলো হলো- শাওয়াল, যুলক্বা'দাহ এবং যুলহাজ্জের প্রথম ১০ দিন। হাজ্জের ইহ্রাম এই সময়ের মধ্যেই বাঁধতে হবে। যদি কেউ এই সময়ের আগে বা পরে হাজ্জের ইহ্রাম বাঁধে, তাহলে যদিও তার ইহ্রাম সঠিক হবে এবং এই ইহ্রাম নিয়ে সে 'উমরাহ্ আদায় করে হালাল হয়ে যেতে পারবে, তবে এই ইহ্রাম নিয়ে হাজ্জের সময়ে হাজ্জ আদায় করলেও তা আদায় হবে না, বরং হাজ্জের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে তাকে ইহ্রাম বাঁধতে হবে। মোটকথা, 'ঈদুল ফিত্বরের রাত থেকে 'ঈদুল আযহার রাত- এই সময়ের মধ্যে হাজ্জের ইহ্রাম বেঁধে হাজ্জ আদায় করে নিতে হবে।

"শাওয়াল, যুলক্বা'দাহ এবং যুলহাজ্জের প্রথম ১০ দিন হলো হাজ্জের জন্য নির্ধারিত সময়" একথার অর্থ এই নয় যে, এই মেয়াদের মধ্যে যে কোন সময় হাজ্জ আদায় করলে তা আদায় হয়ে যাবে। না, বরং এর অর্থ হলো- এই মেয়াদের মধ্যে যে কোন সময় হাজ্জের ইহ্রাম বাঁধা যাবে, তবে হাজ্জ উপরোক্ত সময়ের অন্তর্ভুক্ত নির্ধারিত দিনগুলোতেই আদায় করতে হবে।

সূত্র:- "তাবসীরুন্ নাছিক বি আহকামিল মানা-ছিক 'আলা যূয়িল কিতাবি ওয়াছ্ ছুন্নাহ ওয়াল মা'ছূরু 'আনিস্ সাহাবাহ্"।

দলীল-প্রমাণসহ আরো বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:
www.eshodinshikhi.com / www.learnislaminbangla.com

ইত্তিবা
ইছলামী জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য ত্রৈমাসিক
শেষ পৃষ্ঠা
যিলহাজ্জ– ১৪৩৪ হিজরী, কার্তিক– ১৪২০ বাংলা, অক্টোবর– ২০১৩ ইংরেজী। পৃষ্ঠা সংখ্যা–১২

ক্বোরবানীর তাৎপর্য ও বিধান

আল্লাহ্র (ﷻ) নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রায় সকল উম্মাতের মধ্যেই ক্বোরবানীর প্রচলন ছিল। এটা আগেকার নাবীগণেরও ('আলাইহিমুছ্ ছালাম) ছুন্নাহ্ ছিল। ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:- অর্থ- আমি প্রত্যেক উম্মাতের জন্য ক্বোরবানীর নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছি, যাতে জীবনোপকরণ স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে যেসব চতুষ্পদ জন্তু দান করেছেন সেগুলোর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে। (ছূরা আল হাজ্জ- ৩৪)

তবে আমাদের দ্বীনে ইছলামে ক্বোরবানী একনিষ্ঠ ও একত্ববাদীগণের ইমাম; মুছলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর ছুন্নাহ্ হিসেবে গৃহীত। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর প্রাণপ্রিয় পুত্র 'আরব জাতির পিতা ইছমা'য়ীল-কে (আলাইহিস সালাম) জবাই করার পরিবর্তে তাঁর স্থলে আল্লাহ ﷻ এক মহান ভেড়া ক্বোরবানীর জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্র (ﷻ) নির্দেশে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ইছমা'য়ীলকে (আলাইহিস সালাম) ক্বোরবানী দেয়ার পরিবর্তে সেই ভেড়া ক্বোরবানী দিয়েছিলেন। এ ছিলো আল্লাহ্র (ﷻ) মহান দয়া ও অনুকম্পা।

একারণেই ইমাম ইবনুল ক্বায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ্ ও অন্যান্য 'উলামায়ে কেরাম (রাহিমাহুমুল্লাহ্) বলেছেন যে, **"হাদইয়্ (হাজ্জ বা 'উমরাহ্ পালনকারী আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য মাক্কাহ্তে যে পশু জবাই করে থাকেন, সেটাকে হাদইয়্ বলা হয়)** বা 'ঈদুল আযহা উপলক্ষে যিলহাজ্জ মাসের ১০ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ (অর্থাৎ ইয়াওমুন্ নাহ্র এর এক দিন এবং তাশরীক্বের তিন দিন) পর্যন্ত নির্দিষ্ট পশু জবাই করা, মূলত এটি হলো প্রাণের বিনিময়"। আল্লাহ ﷻ যদি ইবরাহীম ও ইছমা'য়ীল 'আলাইহিমাছ্ ছালাম এর প্রতি এই অনুগ্রহটুকু না করতেন, তাহলে আজ হয়তো প্রতি বছর মুছলমানদের হাদইয়্ বা 'ঈদুল আযহা উপলক্ষে শত সহস্র মানুষ জবাই করতে হতো।

ক্বোরবানীর বিধান: ফিক্বহ্ বিশেষজ্ঞ অনেক 'উলামা ও আয়িম্মায়ে কেরামের মতে আর্থিক দিক থেকে সামর্থবান (যার নিকট মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে, যদিও তা নিসাব পরিমাণ না হয়) প্রাপ্তবয়স্ক মুছলমানের জন্য ক্বোরবানী প্রদান করা ছুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ তথা অতীব জরুরী পালনীয় ছুন্নাহ্।

ইমাম আবূ হানীফাহ্, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল, এক বর্ণনামতে ইমাম মালিক, ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্ (রাহিমাহুমুল্লাহ) তাদের মতে- প্রাপ্তবয়স্ক, সামর্থবান (ইমাম আবূ হানীফাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ এর মতে যার নিকট নিসাব পরিমাণ অর্থ-সম্পদ রয়েছে), মুক্বীম (স্বীয় আবাসস্থলে অবস্থানকারী) মুছলমানের উপর ক্বোরবানী করা ওয়াজিব। তবে যা-ই হোক, ক্বোরবানী করা শরী'য়তে ইছলামিয়াহ্র অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী পালনীয় বিধান, তাতে কারো কোন দ্বিমত নেই। কেউ যদি ক্বোরবানী করবে বলে মানত করে, তাহলে তার উপর ক্বোরবানী করা ওয়াজিব, এ বিষয়েও কারো কোন দ্বিমত নেই। এমনিভাবে কেউ যদি একটি পশু ক্রয় (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

রাছূলুল্লাহ্ (ﷺ) এর বাণী

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাছূল ﷺ বলেছেন:- যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো (বিষের তীব্রতার কারণে) মাথাবিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্ব কামড়ে ধরে বলবে: "আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল"। অতঃপর আল্লাহ্র রাছূল ﷺ এই আয়াত তিলাওয়াত করেন: অর্থ- "আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে কিছু দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে- তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে। অচিরেই ক্বিয়ামাত দিবসে যা নিয়ে তারা কার্পণ্য করছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে"।
(ছূরা আ-লে 'ইমরান- ১৮০) {সাহীহ্ বুখারী- ২/৭৯, হাদীছ নং- ১৪০৩}

হাজ্জ ও 'উমরাহ্ পালনের ছুন্নাহ্সম্মত পদ্ধতি

মূল: আশ্শাইখ 'আব্দুল মুহছিন বিন নাসির আল 'উবাইকান

আপনি যদি হাজ্জ সম্পাদন করতে চান এবং সে উদ্দেশ্য নিয়ে হাজ্জের মাস সমূহের মধ্যে মীক্বাতে (যেখান থেকে হাজ্জের ইহ্রাম বাঁধা হয় সে স্থানে) পৌঁছে যান, তাহলে আপনি তিন প্রকারের যে কোন এক প্রকার হাজ্জ পালন করতে পারেন। এই তিন প্রকার হাজ্জ হলো যথা:-

১। **হাজ্জে তামাত্তু'**। আর এটাই হলো সবচেয়ে উত্তম। হাজ্জে তামাত্তু' হলো- আপনি যদি আপনার সাথে ক্বোরবানীর পশু না নিয়ে যান এবং আপনার হাতে যদি হাজ্জের জন্য পর্যাপ্ত সময় থাকে, তাহলে আপনি মীক্বাত থেকে 'উমরাহ্র নিয়্যাতে ইহ্রাম বাঁধবেন। এক্ষেত্রে আপনি বলবেন- "লাব্বাইকা বি 'উমরাতিন" এবং আপনি 'উমরাহ্র কার্যাবলী সম্পাদন করে হালাল হয়ে যাবেন, স্বীয় স্বাভাবিক পোষাক পরিধান করবেন, আপনার জন্য ইহরামকালীন যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ তখন হালাল হয়ে যাবে। আপনি আপনার স্বাভাবিক কাজ-কর্ম চালিয়ে যাবেন- এমতাবস্থায় ৮ই যিলহাজ্জ যেটাকে ইয়াওমুত্ তারওয়িয়াহ্ বলা হয়, আপনি হাজ্জ সম্পাদনের নিয়্যাত বা সংকল্প নিয়ে ইহ্রামের কাপড় পরিধান করে হাজ্জের যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন করবেন। জেনে রাখবেন! হাজ্জে তামাত্তু' পালন করলে আপনাকে অবশ্যই ক্বোরবানী দিতে হবে।

২। **হাজ্জে ইফরাদ**। আর তা হলো মীক্বাত থেকে "লাব্বাইকা হাজ্জান" বলে হাজ্জ পালনের নিয়্যাত করা। এমতাবস্থায় পবিত্র মাক্কায় পৌঁছে ত্বাওয়াফে ক্বোদূম সম্পন্ন করে ইহ্রাম ভঙ্গ না করে তথা হালাল না হয়ে ইয়াওমুন্ নাহ্র অর্থাৎ ক্বোরবানীর দিন পর্যন্ত ইহ্রাম অবস্থায় থেকে হাজ্জের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করা। হাজ্জে ইফরাদ সম্পাদনকারীর উপর ক্বোরবানী ওয়াজিব নয়।

৩। **হাজ্জে ক্বিরান**। আর তা হলো মীক্বাত থেকে "লাব্বাইকা হাজ্জান ওয়া 'উমরাতান"/ "লাব্বাইকা বি হাজ্জিন ওয়া 'উমরাতিন" বলে হাজ্জ ও 'উমরাহ্র নিয়্যাত একসাথে করা। মাক্কায় পৌঁছার সাথে সাথে ত্বাওয়াফে ক্বোদূম সম্পন্ন করে ইহ্রাম ভঙ্গ না করা বরং পরিপূর্ণরূপে ইহ্রাম অবস্থায় থেকে যাওয়া এবং ৮ই যিলহাজ্জ থেকে ইয়াওমুন্ নাহ্র পর্যন্ত হাজ্জের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করা। ক্বিরান হাজ্জকারীর জন্য ক্বোরবানী ওয়াজিব। তবে মাক্কাহ্র অধিবাসীদের উপর ক্বোরবানী ওয়াজিব নয়।

৮ই যিলহাজ্জ হলো হাজ্জের প্রথম দিন। মূলত এ দিন থেকেই হাজ্জের কার্যক্রম শুরু করতে হয়। ৮ই যিলহাজ্জকে ইয়াওমুত্ তারওয়িয়াহ্, ৯ই যিলহাজ্জকে ইয়াওমুল 'আরাফাহ এবং ১০ই যিলহাজ্জকে ইয়াওমুন্ নাহ্র বলা হয়।

৮ই যিলহাজ্জ, এ দিনে করণীয়

১) আপনি যদি তামাত্তু' হাজ্জকারী হয়ে থাকেন, তাহলে এ দিন ইহ্রামের কাপড় পরিধানের আগে নখ, গোঁফ কেটে-ছেঁটে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ভালোভাবে গোছল করে হাজ্জ সম্পাদনের নিয়্যাত করে ইহ্রামের কাপড় পরিধান করবেন। আপনি যদি পুরুষ হয়ে থাকেন, তাহলে সাদা রংয়ের সেলাইবিহীন একখানা লুঙ্গি ও একখানা চাদর পরিধান করবেন এবং টাখনু ঢাকবে না এরকম একজোড়া সেন্ডেল অথবা মোজা পরিধান করবেন। মাথা উন্মুক্ত রাখবেন; টুপি অথবা পাগড়ী ব্যবহার করবেন না। আর মহিলা হলে, শরী'য়ত নারীদেরকে স্বাভাবিক অবস্থায় যেরূপ পোষাক পরিধানের অনুমতি দিয়েছে সেরূপ স্বাভাবিক পোষাক পরিধান করবেন। তবে ইহ্রাম অবস্থায় নিক্বাব, বোরকা, আচ্ছাদন, মাথায় রুমাল কিংবা হাত আবৃতকারী মোজা ইত্যাদি পরিধান করবেন না।

আপনি (পুরুষ কিংবা নারী) যদি হাজ্জে ক্বিরান অথবা ইফরাদ পালনকারী হয়ে থাকেন, তাহলে তো আপনি আগে থেকেই (৮ই যিলহাজ্জের আগে থেকেই) ইহ্রাম অবস্থায় আছেন। সুতরাং সাবধান! তামাত্তু' হাজ্জ পালনকারীর ন্যায় আপনি নখ, চুল, গোঁফ ইত্যাদি কাটা-ছাঁটা করবেন না।

২) আপনি যদি তামাত্তু' হাজ্জ পালনকারী হয়ে থাকেন, তাহলে এই দিন চাশ্তের সময় আপনি আপনার অবস্থান স্থল থেকেই হাজ্জ সম্পাদনের সংকল্প নিয়ে ইহ্রাম বাঁধবেন। আপনি বলবেন "লাব্বাইকা হাজ্জান"/ "লাব্বাইকা বি হাজ্জিন"।

আর যদি হাজ্জকর্ম সম্পাদনকালীন কোন প্রতিবন্ধকতা আপনার মাঝে দেখা দেয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে "লাব্বাইকা বি হাজ্জিন" বলার সাথে (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রধান সম্পাদক: আবূ মাহ্দী। সহকারী সম্পাদক: মাহ্মূদ হাছান ও আবূ খাদীজাহ্। ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: মুজতাবা আর.বি। গ্রাফিক্স ও সার্কুলেশন ম্যানেজার: আবুল খাইর।
যোগাযোগ: ০১৭৮৭-১০৪৬২৬। প্রকাশনায়: "এসো দ্বীন শিখি" কর্তৃপক্ষ। www.eshodinshikhi.com/www.learnislaminbangla.com
মুদ্রণে: মঈন কম্পিউটার প্রিন্টার্স, রাজা ম্যানশন, জিন্দাবাজার, সিলেট। ফোন ঃ ৭২৬৩৬৮, ০১৭১২-৫০৫২৩৬